সূচিপত্র

প্রথম অংশ : বাংলা বিষয়জ্ঞান

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	**ভাষা ও মাতৃভাষা**	
২	**ভাষা ও সাহিত্য**	
৩	**শিশুতোষ সাহিত্য :** স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, তাৎপর্য – ছড়া ও ছবিতে গল্প পড়া – বোতলে ইঁদুর ছানা – সোনামণি – বছর ঘুরে দেখা – পাতাকুমার – ইতল বিতল – যদু মাস্টার	
৪	**ছড়া:** বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব – ষোলো আনাই মিছে – দূরের পাল্লা	
৫	**কবিতা:** স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, তাৎপর্য – বঙ্গভাষা – সামান্য ক্ষতি – কাণ্ডারি হুশিয়ার – প্রতিদান – তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা	
৬	**ছোটগল্প :** স্বরূপ, তাৎপর্য – তোতা কাহিনী – পুঁই মাচা – নিমগাছ	
৭	**প্রবন্ধ :** স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, তাৎপর্য – কাবুল যাত্রা (সংক্ষিপ্ত রূপ) – সুবেহ সাদেক – একাত্তরের চিঠি	
৮	**নাটক :** স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, উৎপত্তি ও বিকাশ, অবয়ব ও উপাদান – কবর	
৯	**বাংলা ভাষার উপাদান :** ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য	

অধ্যায় ১

ভাষা ও মাতৃভাষা

ভাষা ও মাতৃভাষার ধারণা

ভাষা হলো যোগাযোগ সাধনের উপায়। আদিকালেই মানুষকে জীবন-ধারণের জন্য যূথবদ্ধ হতে হয়েছিল। জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের যেমন একত্রে বাস করতে হয়েছিল, তেমনি খাদ্য আহরণে, বৃহৎ পশু শিকারে যৌথভাবে কাজ করতে হয়েছিল। যৌথ কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি যোগাযোগ মাধ্যমের, যাতে একে অপরের নির্দেশনাটি বুঝতে পারে। এজন্য তারা সৃষ্টি করেছিল পরস্পরের কাছে বোধগম্য ধ্বনি-সংকেতের। এ ধ্বনিমালা তারা হয়তো প্রকৃতি থেকেই গ্রহণ করেছিল। শিশিরকুমার দাশের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ের ধ্বনিমালা সীমিত থাকার কারণে যোগাযোগ স্থাপনের পরিসর ছিল সীমিত। এই সময়ের ভাষাকে বলা যেতে পারে 'বদ্ধভাষা' (Closed Language)। এই সীমিত ধ্বনিমালার বহুমাত্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা এবং তার মধ্যে অর্থ আরোপের দক্ষতার কারণে বদ্ধভাষা ক্রমশ মুক্তভাষায় (Open Language) পরিণত হয়। সম্ভবত এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল ভাষার। বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্ট ভাষাসমূহ ক্রমান্বয়ে সুসংহত রূপ লাভ করেছে।

ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। মনোভাব প্রকাশের জন্য মানুষ তার বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনি সৃষ্টি করে। এধ্বনিগুলো মিলে তৈরি হয় শব্দ। এক বা একাধিক শব্দ মিলে তৈরি হয় বাক্য। মানুষ মনোভাব প্রকাশের জন্য যে সকল ধ্বনি উৎপাদন করে তাতে থাকে অর্থ বা অর্থের ইঙ্গিত। শব্দ আর বাক্যে থাকে পুরো অর্থের প্রকাশ। অবশ্য ধ্বনি বা শব্দে অর্থ যুক্ত করার বিষয়টি মানুষের আরোপিত। একেকটি জনগোষ্ঠী নিজেরা ঠিক করে নেয় কোন শব্দ দ্বারা কোন অর্থ প্রকাশ করবে।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন –

- 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯)।'
- 'মনের ভাব প্রকাশ করার নিমিত্তে বিভিন্ন জাতি বা সমাজের সকল সভ্যের বোধগম্য বাক্যসমূহের সমষ্টিকে সেই জাতির ভাষা বলে' (সুকুমার সেন, ১৯৭১)।
- আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৮৫) এর মতে 'ভাষা হচ্ছে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান দ্বারা গঠিত এবং বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত।'

ভাষার বৈশিষ্ট্য

পূর্বে বর্ণিত ভাষার সংজ্ঞাসমূহ থেকে অনুমান করা যায় যে এটি বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত হতে হয়। অর্থবোধক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে জনসমাজে যোগাযোগ স্থাপনে ভূমিকা রাখে। বস্তুত অর্থবহতা ভাষার প্রধান গুণ। মুখ দিয়ে ভাষা হিসেবে যে ধ্বনি বের হবে তার অর্থ থাকতে হবে এবং তা হবে মনের ভাব প্রকাশের বাহন। এই ভাষা অন্যের কাছে বোধগম্য হতে হবে। এ কারণে পশুপাখির কথা ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রবদ্ধ করা যেতে পারে –

- ভাষা কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত
- ভাষার অর্থদ্যোতকতা বিদ্যমান
- একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা প্রচলিত ও ব্যবহৃত
- ভাষা মনোভাব প্রকাশক, অর্থাৎ পরস্পর ভাব-বিনিময়ের একটি মাধ্যম
- ভাষা বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি সহযোগে উচ্চারিত হয়
- ভাষা ধ্বনি প্রতীকের একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ্য বিন্যাসব্যবস্থা।

শিশিরকুমার দাশ ভাষার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অতিরিক্ত একটি বিশেষ বিষয় আলোচনার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভাষা বক্তিগত বিষয় নয়; বরং "সামাজিক সম্পত্তি, বিশেষ সমাজের রচনা, সমাজের দ্বারা সমর্থিত, গৃহীত এবং সংরক্ষিত" (পৃ. ১৮)। অর্থাৎ, ভাষার সাথে সমাজের সম্পর্ক গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে।

মাতৃভাষা কী?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সব ভাষাই কি মাতৃভাষা? কীভাবে ভাষা ও মাতৃভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করা যায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা সম্পর্কিত ধারণা আবশ্যক। আমরা প্রতিদিন আমাদের চারপাশে প্রকৃতিজগতে প্রাণী ও উদ্ভিদরাজ্যের অসংখ্য সদস্যের জন্ম ও বিকাশ দেখতে পাই। আমরা কি লক্ষ করেছি তাদের জন্ম ও বিকাশে একটি মিল রয়েছে? তারা প্রত্যেকেই বীজ বা ভ্রূণ থেকে জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর পরিবেশ থেকেই পুষ্টি গ্রহণ করে বিকাশ লাভ করে। মানবশিশুর ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটে থাকে। মানবশিশুও মানবভ্রূণ থেকে জন্ম লাভ করে এবং পরিবেশ থেকে তার পুষ্টি গ্রহণ করে বিকাশ লাভ করে। মানবশিশুর বিকাশ দুভাবে ঘটে–শারীরিক ও মানসিক বিকাশ। শিশু তার মা ও প্রকৃতি থেকে খাবার

সংগ্রহ করে যেমনি তার দেহের বিকাশ সাধন করে থাকে, তেমনি ভাষার মাধ্যমে মানসিক বিকাশ সাধনও করে থাকে। শিশু প্রকৃতিকে বুঝতে, চিন্তা করতে, সর্বোপরি প্রকাশ করতে ভাষাকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ শিশুর জন্ম ও বিকাশের সাথে মাতৃভাষার ধারণাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

মাতৃভাষা মানুষের সহজাত বিকাশের ভাষা, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না প্রকাশের একান্ত আপনার ভাষা। শিশুরা অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে অতি সহজে মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে পারে। মাতৃভাষা আদি ও অকৃত্রিম ভাব-বিনিময়ের ভাষা, ব্যক্তিমনের একান্ত উপলব্ধি ও অনুভূতির ভাষা। সাধারণভাবে মনে করা হয় মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা হলো শিশুর পরিপার্শ্বে যোগাযোগের সাধারণ ভাষা। অর্থাৎ শিশু জন্মেই যে ভাষার সাথে পরিচিত হয় সে ভাষাই তার মাতৃভাষা। এজন্য মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা (First Language) বলা হয়। একভাষিক রাষ্ট্রে মাতৃভাষা নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও বহুভাষিক রাষ্ট্রে শিশু প্রচলিত ভাষাসমূহ থেকে একটি ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে।

মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য

মানবশিশু সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপন শুরু করে তার মাতৃভাষা নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আমরা জানি, প্রাণিজগতের সাধারণ নিয়মে মায়ের মাধ্যমেই পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। শিশু প্রথমে তার মাতৃগর্ভে বিভিন্ন ধ্বনি-তরঙ্গ শ্রবণ করে এবং এ ধ্বনি-তরঙ্গ শুনে সে সাড়া প্রদান করে। সে ধ্বনি-তরঙ্গগুলো তার পরিপার্শ্ব এবং প্রধানত তার মায়ের কাছ থেকেই আসে। মা বা তাঁর চারপাশের মানুষজন প্রতিক্ষণ যে ধ্বনি বা শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেন তাই শিশুর কাছে পৌঁছায় (মুহাম্মদ নাজমুল হক, ১৯৯৯)। আমরা আগের অধিবেশনে জেনেছি শিশুর মাতৃভাষা বলতে আমরা সেই ভাষাকেই বুঝি, যা শিশুর পরিপার্শ্বের সাধারণ যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই শিশুর কাছে প্রথম যে ভাষার ধ্বনি-তরঙ্গ পৌঁছায় এবং যার ভেতর দিয়ে সে জেগে ওঠে এবং সবকিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, সেটি হলো তার মাতৃভাষা। শিশু জন্মগ্রহণ করেই বিচিত্র ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হয়। এ সকল ধ্বনি-তরঙ্গের আঘাতে সে চোখ মেলে তাকায় এবং আরো বিচিত্র অবয়বরাশি ও দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জের মুখোমুখি হয়। এর কোনোটির সাথেই সে পূর্বপরিচিত নয়। ধীরে ধীরে সে মূলত মায়ের ভাষার মাধ্যমেই এসব বিচিত্র অবয়ব ও বস্তুপুঞ্জের নাম ও তার সাথে সম্পর্ক আবিষ্কার করে। শিশু জন্মের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই মাতৃভাষার কিছু ধ্বনি চিহ্নিত করতে শেখে। প্রথমেই শেখে মায়ের ভাষার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে। তাই আমরা দেখি, শিশুর কান্নার সময় মায়ের শব্দ শুনতে পেলে তার কান্না থেমে যায়। এতে বোঝা যায়, শিশু মায়ের উচ্চারিত ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য আলাদা করতে পারছে। শিশুর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনিটিও হয় 'ম' সংশ্লিষ্ট। সে মম মাম বলে জগতের অনেক কিছু বোঝাতে চায়। যেমন–'মাম' বলতে পানি, 'মাম' বলতে মা ইত্যাদি। শিশু তার জন্মের প্রথম ছয় মাস অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তার চারপাশের মানুষের ভাষার ব্যবহার-কৌশল লক্ষ করে। ভাষা উচ্চারণের সময় তাদের ঠোঁটের নাড়াচাড়া, মুখভঙ্গি তথা উচ্চারণ-কৌশল খেয়াল করে। ছয় মাস বয়সেই ধ্বনি উচ্চারণ করার চেষ্টা করে, যাকে আমরা বাবলিং (Babbling) বলি। এক বছরের মধ্যে সে প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করে, যাকে মনোবিজ্ঞানীরা 'এক-শব্দ পর্যায়' বলে অভিহিত করে থাকেন। পরবর্তী ৩/৪ মাসের মধ্যে দশটি পর্যন্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে, যার অধিকাংশই হয় সম্বোধনবাচক।

ভাষার ও মাতৃভাষার গুরুত্ব

আদিমযুগে যূথবাদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হতে হয়েছে। সেই বিবেচনায় মানুষ ভাষা তৈরি করেছে তার নিজস্ব প্রয়োজনে। এখন পর্যন্ত মানব সমাজেই এই ভাষার

অস্তিত্ব, লালন ও বিকাশ। সুতরাং মানব জীবনে ভাষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। মানব সমাজে ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো:

- ভাষা একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক; উপরন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এর হস্তান্তর ঘটে ভাষার মাধ্যমে
- মানুষের সকল আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার প্রকাশমাধ্যম হলো ভাষা
- সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি সৃজনশীল বিষয়সমূহ চর্চার ভাষা
- সভ্যতার অগ্রসরতায় ভাষার ভূমিকা অপরিসীম
- সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও এর বিকশে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে
- দৈনন্দিন যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হলো ভাষা।

ভাষার উল্লিখিত গুরুত্বসমূহ অনুধাবনের ক্ষমতা এবং প্রয়োগের দক্ষতা একজন ব্যক্তি তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই অর্জন করে না। শিশুর ভাষাকে চেনার জগৎ মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। কারণ, শিশু যখন প্রথম শব্দটি উচ্চারণের চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যদের সাহায্যেই তখন সেটি সম্ভব হয় (মুহাম্মদ নাজমুল হক, ১৯৯৯)। যেমন, শিশু যখন ম-ম-ম ধ্বনিটি উচ্চারণের প্রচেষ্টা চালায় তখন মা মনে করেন শিশুটি মা বলার চেষ্টা করছে। তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং শিশুটিকে আদর করেন। এতে শিশুটি উৎসাহবোধ করে। এভাবে পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম বা সম্পর্কবাচক শব্দ তাকে শেখাতে সকলে উৎসাহিত হন। তখন শিশুটি ভাঙা ভাঙা শব্দ বলতে শেখে। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যেসব শব্দ বিনিময় করেন শিশু তা-ই অনুসরণ করে। পরিবারের সদস্যরা যখন পানিকে পানি বলে চিহ্নিত করেন, তখন শিশুটিও বুঝতে পারে তার 'মাম' বস্তুটির নাম আসলে 'পানি'। কিংবা জানালার পাশে দাঁড়ানো প্রাণীটির নাম কাক। অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের সবকিছুর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে অর্জিত এই পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই সে এক সময় সমাজের বৃহত্তর পরিসরে গমন করে। শিশু যে সমাজে মেশে সে সমাজের ভাষা যদি তার মাতৃভাষাই হয়ে থাকে তাহলে শিশুর সামাজিক বিকাশ অত্যন্ত সহজ হয়।

চিত্র : মা শিশুকে পাখি দেখানোর মাধ্যমে অনুষঙ্গ স্থাপন করছেন

আমরা জানি ভাষার রয়েছে চারটি দক্ষতা। প্রথম দুটি দক্ষতা–শোনা ও বলা। শৈশব থেকে পারিবারিক পরিবেশে শোনা ও বলা দক্ষতা গড়ে ওঠে। সে মূলত মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ধ্বনি শুনে তা

অনুকরণের মাধ্যমে বলতে শেখে। প্রসঙ্গত নোয়াম চম্‌স্কি শিশুর ভাষাবোধের ভিত্তি হিসেবে'পরিবারের ভাষা' বুঝিয়েছেন। তার ধ্বনিমূলগুলো গঠিত হয় পরিবার থেকে। তবে এই দুটি দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শোনা ও বলা দক্ষতা পারিবারিক পরিবেশে সূচনা হলেও পড়া ও লেখা দক্ষতার সূত্রপাত ঘটে প্রতিষ্ঠানে। এ অবস্থায় শিশুর মাতৃভাষা যদি স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকে তাহলে শিশুর পক্ষে ভাষার এ চারটি দক্ষতা অর্জন সহজতর হয়। কিন্তু স্কুলের ভাষা যদি ভিন্ন হয় তাহলে তাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। অভিবাসী শিশুদের ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশু স্কুলে উৎসাহিত নাও হতে পারে। পর্যাপ্ত সাহায্য না পেলে শিশু অসামাজিক, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। স্কুলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে পারে। এজন্য সারা বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করা হয়।

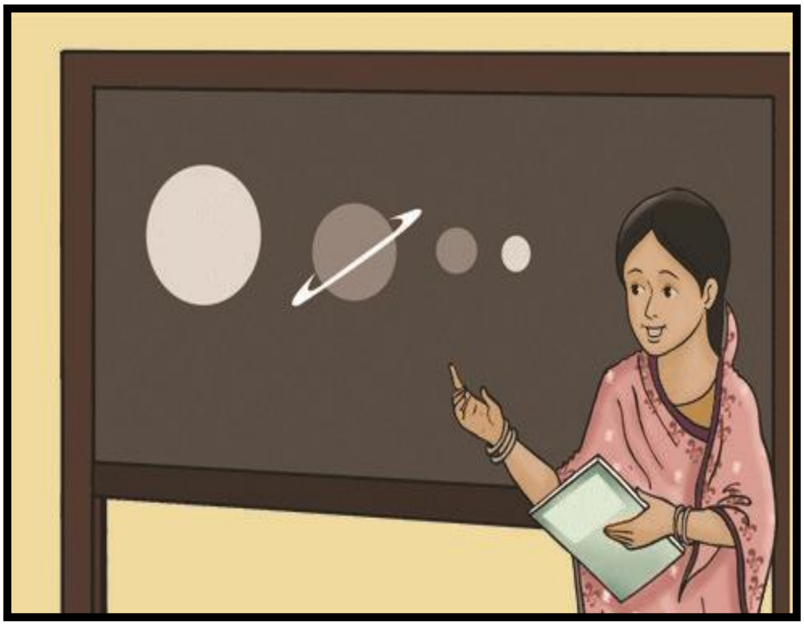

চিত্র : মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অধিক সহজ ও কার্যকর

প্রাথমিক স্তরে শিশু ভাষার মাধ্যমে শুধু তার মাতৃভাষাকেই জানে না, অন্যান্য বিষয়ও তাকে জানতে হয়। এ জানার অনেকগুলো শিশুর কাছে একেবারেই নতুন। যেমন – মহাদেশ, গ্রহ বা নক্ষত্রের নাম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শিশুর জানার মাধ্যমটি যদি হয় মাতৃভাষা তাহলে সেটা তার জন্য অনেক সহজ হয়। যেমন, শিক্ষক যদি বলেন আমরা রাতের বেলা আকাশে যে অসংখ্য তারা দেখি আসলে তা নক্ষত্র। আমাদের সূর্যও তেমনি একটি নক্ষত্র। এক্ষেত্রে 'তারা' শব্দটি হয়তো শিশুর কাছে আগে থেকেই পরিচিত। ফলে বিষয়টি তার কাছে নতুন মনে হয় না। কিন্তু মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করলে বিষয় ও ভাষা মিলিয়ে শিশুর কাছে তা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ও মাতৃভাষায় শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। এতে শিশুর শিখন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। শিশুর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় প্রদান করা সম্ভব হয়।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করার পর শিক্ষার্থীর জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব কমে না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয় পর্যায়ে অর্জিত মাতৃভাষার সক্ষমতা ব্যক্তিজীবন, কর্মজগৎ ও সামাজিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেবল মাতৃভাষাতেই একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনার প্রকাশ এবং সৃজনশীল সক্ষমতার সর্বৈব বিকাশ সাধিত হওয়া সম্ভব। আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের উদাহরণ জানি, যিনি জনপ্রিয়তার আশায় প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হন। যদিও তিনি তাঁর এই ভুল

অনুধাবনে সক্ষম হন এবং বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করে সৃজনশীলতার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হন। বিশ্বসাহিত্যে এই ধরনের উদাহরণ বিরল নয়। বস্তুত মাতৃভাষায় সক্ষমতা একজন ব্যক্তির পরবর্তী ভাষাশিখনের ভিত রচনা করে। সুতরাং, অন্যান্য যে কোন ভাষাশিখনের পূর্বে মাতৃভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে – আগে চাই বাংলা ভাষায় গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনীশক্তি ও মানস গঠনে মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ২

ভাষা ও সাহিত্য

সাহিত্যের ধারণা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় সাহিত্যের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য বা সম্মিলন। সাহিত্যের কাজ হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য। তিনি সাহিত্যকে তুলনা করেছেন বনস্পতি বৃক্ষের সাথে। যার আয়ু দীর্ঘ, দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার। সে দৈনিক আশু-প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। বিচিত্র্য ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের ও রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে নিজের অস্তিত্বের চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে (মাহাবুবুল আলম, ১৯৭১)। সাহিত্য হচ্ছে জীবনের দর্পণ স্বরূপ। 'সাহিত্য আমাদের জীবন-সত্যেরই সহজ পাঠ (সাহিত্য বিচিন্তা, হরপ্রসাদ মিত্র)।' ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সময় ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। সাহিত্য পাঠকমনকে পরিচয় করিয়ে দেয় সময়ের সাথে, সংস্কৃতির সাথে, মানুষের সাথে। মানুষের মনের অনুভূতি, দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশমান হয় সাহিত্যে; লেখকের লেখনীর মধ্য দিয়ে। সাহিত্যকে কখনো কোন সীমা বা পরিসরে নির্দিষ্ট করে বাঁধা যায় না। সে প্রয়াস বৃথা। মানুষের জীবনের অসীম বৈচিত্র্য নিয়ে নানাদিকে সাহিত্যের বিচরণ। সাহিত্য সৃষ্টি করে একটি ব্যক্তিমানস কিন্তু একক মনের গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্য হয়ে ওঠে বিশ্ব মানবের মনের কথা। সাহিত্য তুলে ধরে কালের চিত্র, কিন্তু কালোত্তীর্ণ হয়ে। সাহিত্য তার মাধুর্য দিয়ে ব্যক্তিমনকে আনন্দ দেয়, তেমনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে বক্তব্য ওঠে আসে পাঠকসমাজের কাছে, তা তাদের সচেতন করে। কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁর রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। সাহিত্য একজন ব্যক্তি মানসের অনুভূতি প্রকাশের সুললিত চারণক্ষেত্র। শুরু থেকে অনেক প্রদীপ্ত কবি ও সাহিত্যিকজন সাহিত্য রচনা করে আসছেন এবং সাহিত্যের স্রোত প্রবহমান রেখেছেন। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকজন অনস্বীকার্য অবদান রেখে গেছেন।

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা থেকেই সাহিত্য রচিত হয়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিকের সাথে সংযোগ, কল্পজগতের প্রয়োজনীয়তা এবং রূপপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্য প্রধানত দুই ধরনের- মন্ময় সাহিত্য (subjective literature) এবং তন্ময় সাহিত্য (objective literature)। যখন সাহিত্যিক একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন, তখন তাকে মন্ময় সাহিত্য বলা হয়। যেমনঃ কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। আর সাহিত্যে বস্তুসত্তা যখন প্রাধান্য পায় তখন তাকে তন্ময় সাহিত্য বলে। যেমনঃ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গবেষণাধর্মী লেখা ইত্যাদি। এছাড়া সাহিত্যকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়; জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য। জ্ঞানের সাহিত্যে লেখকের বিষয়বস্তুতে ব্যক্তি অনুভূতির চেয়ে বস্তুনিষ্ঠতা ফুটে ওঠে। যেমনঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্ব পরিচয়', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা ইতিহাস' ইত্যাদি। আর ভাবের সাহিত্যে লেখকের বিষয়বস্তুতে স্বীয় আবেগ অনুভূতির প্রকাশ পায়। যেমনঃ কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি।

সকল রচনাই সাহিত্য নয়। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় তা ব্যক্তিমনে আনন্দের সঞ্চার করে থাকে। সাহিত্য পাঠ করে পাঠক জ্ঞানের সাথে আনন্দআস্বাদ করে। সাহিত্য হতে হলে রচনাটিতে কিছু গুণাবলি থাকতে হয়। সাহিত্যিকের মন, বস্তুজগৎ, ও প্রকাশভঙ্গি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিকের নিজ মনের প্রকাশ থাকলেই তা সাহিত্য হবে না, প্রকাশ হতে হবে ব্যক্তি নির্বিশেষ। সাহিত্য একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়েও ব্যক্তিনির্বিশেষ। তাছাড়া বস্তুজগত যা লেখকের নিজ ব্যক্তিচিত্ত ছাড়া প্রকৃতি, মানুষের অনুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ও বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি। সাহিত্যে লেখকের প্রকাশভঙ্গি থাকবে অত্যন্ত সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকা চাই। লেখকের প্রকাশভঙ্গির ওপর নির্ভর করে সাহিত্য পাঠকসমাজের কাছে কতটা গৃহীত হবে। লেখকের কথাগুলো যদি পাঠক বুঝতে না পারে তবে তা সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠে না। একজন সুসাহিত্যিক তাঁর লেখায় গুণাবলিগুলোর সুষম বণ্টন করে থাকেন। সাহিত্য হতে হলে এসব বিষয়কে সামনে রাখতে হবে। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক থাকে। এসব দিক মিলিয়ে সাহিত্যের চারণ ভূমি সমৃদ্ধ হয়। যে ভাষায় সাহিত্য চর্চা বেশি হয় সে ভাষা তত গতিশীল ও পরিশীলিত হতে থাকে। সাহিত্য ভাষাকে গতিশীলতা দান করে।

সাহিত্যের ভাব-রস

মানুষের মনের চিত্তবৃত্তি বা emotion-কে ভাব বলা হয়। আর এই ভাব থেকে উৎপন্ন হয় রসের। রসের মানসিক উপাদান হচ্ছে ভাব। আর বাহ্যিক উপাদান যা কবির সৃষ্টি, সাহিত্য, তার সাথে একাত্ম হয়ে মনের ভাব রসে রূপান্তরিত হয়। ভাব ও রসের ক্ষেত্র দুটি ভিন্ন। ভাব উৎপন্ন হয় বস্তুজগৎ থেকে, ভাব লৌকিক। কিন্তু রস সৃষ্টি হয় কাব্যজগতের অলৌকিক মায়াময় জগতে। বস্তুত মনে কোন ভাব না থাকলে কাব্যসাহিত্য পড়ে রসের সঞ্চার হবে না। 'লৌকিক জগতের কোন কারণে মানুষ শোকার্ত হলে, তার মনে শোক ভাবের উদ্রেক হয় তবে তা কিন্তু শোকার্ত মনে রসের সঞ্চার করেনি। কবি বা লেখক যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তাঁর লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম 'করুণ' রস। এই করুণ রস শোকের ভাব নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, তা চোখে জল আনলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে' (মাহাবুবুল আলম, ১৯৭১)। সাহিত্যের রস বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন- বীর, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, ভয়ানক, শান্ত ইত্যাদি। যে ভাব থেকে এই রসগুলো উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময়, শম ইত্যাদি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-তে বীর রসের প্রকাশ দেখতে পাই। যেখানে মেঘনাদ চরিত্রটিতে উৎসাহ ভাবের থেকে বীর রসের সঞ্চার হয়। কবির এ-মহাকাব্য পাঠ করে পাঠক বীর রস আস্বাদন করতে সক্ষম।

ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, এ বাসনা আবহমান। মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। ভাষা মানুষের প্রকাশ মাধ্যম। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ বা যোগাযোগ করে থাকে ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ভাষা ভাব, চিন্তা ও আবেগের বাহন। সবাই ভাষার মাধ্যমে নিজ নিজ ভাব, আবেগ ও চিন্তা প্রকাশ করতে চায়। ভাষার এই ব্যবহার যে যত সুন্দর, মার্জিত, স্বচ্ছ, সাবলীল, পরিচ্ছন্ন হবে ভাষার এই ব্যবহারটি তখন সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হবে। সে ক্ষেত্রে রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহামূল্যবান একটি বিষয়। ভাষা বেঁচে থেকে মানুষের ব্যবহার ও চর্চার মধ্য দিয়ে। ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার ও চর্চা হয় সাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্যের ব্যবহারে ভাষাকে পরিশীলিত ও পরিমার্জন করা হয়। ভাষা অলঙ্কৃত হয় সাহিত্যে ব্যবহারের ফলে। সাহিত্যে ব্যবহার হয়ে ভাষা ছন্দ পায়, গতিশীলতা পায়। ভাষা ও সাহিত্যের আরও একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হল ভাষা যখন সাহিত্যে ব্যবহার করা হয় তখন ভাষার রূপটি কেমন তার ওপর নির্ভর করে সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা। ভাষার সাবলীল প্রাঞ্জল ব্যবহার পাঠক সমাজের কাছে অধিক সমাদৃত। জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহারে সাহিত্য সার্থকতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষারীতির চেয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষারীতি পাঠক সমাজে অধিক প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। কারণ দুটি ভাষারীতির ব্যবহারে পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস, ভাব প্রকাশের সাবলীলতায়। ভাষা যত জটিল ও দুর্বোধ্য হবে মানুষ সে ভাষা ব্যবহারে অনাগ্রহী হবে। এতে করে ভাষাটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। ব্যবহার না করলে কোন ভাষাই বেঁচে থেকে না। যে ভাষায় যত বেশি কাজ করা হয়, সাহিত্য রচনা করা হয় সে ভাষা বিলুপ্ত হয় না। ব্যবহারের ফলে ভাষার রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে, পরিমার্জিত হতে থাকে। সাহিত্যে পূর্বে একটি শব্দ যে অর্থ বহন করতো বর্তমানে তা পরিবর্তিত হতে পারে। পূর্বে 'সন্দেশ' শব্দটি ব্যবহার হতো তত্ত্ব বা তথ্য অর্থে কিন্তু বর্তমানে 'মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য' বুঝায়। এভাবে সময়ের সাথে ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন হয়ে থাকে। দৈনন্দিন মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা এক নয়। মুখের ভাষা আমরা যেমন ভাবে খুশি সেভাবেই ব্যবহার করি কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা পরিশীলিত, নির্বাচিত হতে হয়। ভাষা, ভাষিকরীতি ও শব্দ সংরক্ষিত হয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। সাহিত্য ভাষাকে সংরক্ষণ করে। ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রতিদিনের ব্যবহার্য ভাষাকে রবি ঠাকুর ওষধির সাথে তুলনা করেছেন। যা ক্ষণকালের ফসল ফলাতে জন্মে ক্ষণে মরে। প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়। ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। কিন্তু সাহিত্য তা নয়। সাহিত্যকে বনস্পতি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যার জন্ম হয়নি। স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে তার বিচরণ। তাই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ও চর্চার ফলে সাহিত্যের জন্ম।

বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিক

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, ছড়া, প্রবন্ধ, মহাকাব্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রম্য রচনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এসব আঙ্গিকে অবদান রেখেছেন বিভিন্ন কবি ও লেখক। সাহিত্রের এসব আঙ্গিক সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

ছড়া

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ছড়া। বাংলা ভাষার প্রাঞ্জল সাহিত্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায় লোকমুখে প্রচলিত ছড়াগুলোয়। ছড়া গভীর কোন ভাবার্থ নয়, ছড়ার বিষয় হচ্ছে ছন্দের আনন্দ। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে এ-আনন্দ পরিবেশিত হয়। আনন্দের এই সার্বজনীনতা ছড়াকে ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বত্র এবং এর মধ্যে প্রবেশ করেছে বর্ণিল বৈচিত্র্য। সম্ভবত সে কারণেই সময়ের পরিক্রমায় ছড়া হয়ে উঠেছে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রত্যয়েরও প্রতিবাদী হাতিয়ার। বাংলা সাহিত্যে শিশুতোষ ছড়ার প্রসঙ্গ এলেই যে নামটি সবার আগে পাঠকমনে ভেসে ওঠে, সে নাম সম্ভবত সুকুমার রায়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, রোকনুজ্জামান দাদাভাই, শামসুর রাহমান ইত্যাদি নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছড়ার ছন্দকে নানা প্রকরণে প্রকাশ করেছেন। এর ফলে শুরু হয় ছড়ার বহুমাত্রিক যাত্রা।

কবিতা

ভাষা যখন নিবিড় উপলব্ধিতে আবেগ ও প্রাণময় হয়, তখন তার ভিতরে একটি বেগ ও গতির সঞ্চার হতে থাকে। এই বেগ বা গতির সংযত ও পরিমিত প্রকাশই কবিতা। 'শব্দ' ভাব কল্পনা ও অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন। কবিতা মূলত জীবন-দীপিকা বা জীবন-জিজ্ঞসা। কবিতার আবেদন হৃদয়ের কাছে অর্থাৎ অনুভূতি সাপেক্ষ। কবিতা আবেগদীপ্ত উপলব্ধির ভাষা। কবিতা দুই ধরনের- মন্ময় বা গীতি কবিতা ও তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা। মন্ময় কবিতায় কবি নিজের অন্তর অনুভূতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ভাবনা-চিন্তা কাব্যের সামগ্রী রূপে গ্রহণ করে কবিতা রচনা করেন। মন্ময় কবিতা হচ্ছে ভক্তিমূলক, স্বদেশপ্রীতিমূলক, প্রেমমূলক, সনেট, প্রকৃতিবিষয়ক, শোকগীতি, স্তত্র, চিন্তামূলক কবিতা। তন্ময় কবিতা হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা। গাথা,মহাকাব্য, নীতিকবিতা, রূপক, ব্যঙ্গকবিতা, লিপিকবিতা তন্ময় কবিতার উদাহরণ। বাংলা কবিতা রচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম অগ্রগণ্য। তাছাড়া জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ প্রমুখ কবিজন স্মরণীয়। মন্ময় কবিতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের -

এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘনঘোর বরিষায়

এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে

তপনহীন ঘন তমসায়।

তন্ময় কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

ছোটগল্প

ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি মনে আসে। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রচয়িতা তিনি। সাহিত্যে ছোটগল্প লেখকের আত্মসচেতন সৃষ্টি। এতে বিশেষ ধরনের গঠনরীতি, বিষয়বস্তু চয়ন, চরিত্র সৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশ সৃষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রভৃতি লক্ষ্য রাখতে হয়। ছোটগল্পের আরম্ভ ও শেষ নাটকীয় হয়। লেখক জীবনের খণ্ডাংশ মাধুর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ছুটি', 'কাবুলিওয়ালা', 'হৈমন্তী', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'শাস্তি', ইত্যাদি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মহেশ', 'বিলাসী', 'মামলার ফল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস

উপন্যাস হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করে সৃষ্ট বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম। উপন্যাসে একটি গল্প, চরিত্র, নাটকীয়তা ও গতিশীলতা থাকবে। ঘটনা কয়েকটি চরিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। ভাষা যত সহজ সাবলীল হয় পাঠক তত আকৃষ্ট হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে ভাষারীতির এই সহজ ও সাবলীলতার কারণে। উপন্যাস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন – মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি।

নাটক

নাটক কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শাখা। নাটক প্রধানত দৃশ্য কাব্য এবং এটা সকল প্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য। দৃশ্য কাব্য ও শ্রাব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত গতিমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। সনাতন নাট্যকারগণ নাটকের তিনটি ঐক্য মেনে চলতেন- সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। প্রত্যেক নাটক সাধারণত পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থি-মোচন ও উপসংহার। নাটক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন- ট্র্যাজেডি নাটক (মুনীর চৌধুরীর রক্তাক্ত প্রান্তর), কমেডি নাটক (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস), ঐতিহাসিক নাটক

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান, নুরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত), পৌরাণিক নাটক, প্রহসন (মাইকেল মধুসূদন দত্তের একেই কি বলে সভ্যতা, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

লেখক তাঁর কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন তাকে প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধে ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বৈচিত্র্য থাকলেও সাধারণত গদ্য ও নাতিদীর্ঘ করে লিখতে হয়। প্রবন্ধ দুই ধরনের- তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ ও মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অধ্যায় ৩

শিশুতোষ সাহিত্য

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কারণ এ সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার বেশি প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে তখন শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন দেখা দেয়। রাধাকান্ত দেব, তারিনীচরণ মিত্র, রায় কমল সেন প্রমুখের উদ্যোগে কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি উপদেশমূলক আঠারোটি গল্পের সমন্বয়ে প্রথম শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। এ পুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত রচনা শিশুতোষ পর্যায়ের বলা না গেলেও এটি ছিল শিশু সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক প্রয়াস। পরবর্তী কালে এ সম্ভার আরও সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের শ্রম, মেধা ও নিষ্ঠায়। এ সময়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'খুকুমণির ছড়া' নামে মানুয়ের মুখে মুখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছড়ার একটি সংকলন করে শিশুসাহিত্যের নতুন ধারার সূচনা করেন। তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় গল্প, ছড়া, কবিতা ও জীবজন্তু বিষয়ক কাহিনী। তিনি পশুপাখির মুখ দিয়ে মানুষের মতো কথা বলিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে ক্ষুদে পাঠকদের মন জয় করেন। এ ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের সৃষ্টির স্পর্শে বাংলা শিশুসাহিত্য বিষয়বেচিত্র্যে ও প্রকরণে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। শিশুতোষ সাহিত্যের সংগ্রহ, সৃষ্টিশীল রচনা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যে নবতর মাত্রা সংযোজন করেন। কাজী নজরুল ইসলামও অনেক কালজয়ী শিশুতোষ সাহিত্যের স্রষ্টা। তবু বলা যায়, সুকুমার রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম, অন্নদাশঙ্কর রায়, আহসান হাবীব, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, এখলাসউদ্দিন আহমদ, সুকুমার বড়ুয়া এবং এ রকম আরও অনেকের সঙ্গে সাম্প্রতিক লুৎফর রহমান রিটনের মতো কবি ও ছড়াকারদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের শিশুপ্রিয় সাহিত্যজগৎ।

শিশুতোষ সাহিত্যের স্বরূপ

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী '১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু'। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতেও কেবল ১৮ বছর পর্যন্ত সকলকে শিশু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে বর্তমান আলোচনায় শিশু বলতে কেবল প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের গণ্য করা হয়েছে।

'শিশুতোষ' কথাটির দুটি অংশ : 'শিশু' এবং 'তোষ'। শিশু কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আর 'তোষ' মানে হলো 'আনন্দ' বা 'খুশি'। 'সাহিত্য' হলো মানুষের চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ বা বিভিন্ন ধরনের রচনা। প্রকৃতপক্ষে গল্প, ছড়া, কবিতার মাধ্যমে লেখকের চিন্তাধারা ও কল্পনার যে লিখিত রূপ দেখা যায় তা হলো সাহিত্য। 'শিশুতোষ সাহিত্য' হলো, অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লিখিত ছড়া, কবিতা ও গল্প, যা শিশুর বয়স-উপযোগী, চাহিদা অনুযায়ী লেখা হয়েছে এবং যা পড়তে শিশুরা আনন্দ পায়, যা পড়ে শিশুরা খুশি হয় এবং মজা পায়।

সহজ করে বললে, শিশুদের উপযোগী সাহিত্যই শিশুতোষ সাহিত্য। গল্প হচ্ছে শিশুতোষ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারা। শিশুরা যে ধরনের গল্প, কাহিনী পছন্দ করে, তারই সুবিন্যস্ত সাহিত্যরূপ শিশুতোষ গল্প। ধরা

যাক, ছবির বইয়ের কথা। শুধু ছবি, কোনো কথা নেই। ছবির মধ্যেই অনেক ঘটনা বা কাহিনী লুকিয়ে আছে। একটা ছবি আসলে অনেক কথা বলে। শিশুর কল্পনাশক্তি এই কথা বা ভাষা বুঝতে সহায়তা করে।

শিশুতোষ সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ

শিশুতোষ সাহিত্যে অনেক ধারা আছে। ছবির বই, ছড়া, গল্প, ছবিতে গল্প, ছবি প্রধান গল্প ইত্যাদি। আবার গল্পেরও নানা আঙ্গিক এখানে রয়েছে। যেমন – রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, গল্প জীবনী, হাসির গল্প, ব্যাঙ্গাত্মক গল্প, সামাজিক পরিবেশের গল্প, কমিক, নৈতিক গল্প, প্রকৃতি নিয়ে গল্প ইত্যাদি।

শিশুতোষ সাহিত্যের তাৎপর্য

কোনো ভাষা শেখার অর্থ হলো শোনা, বলা, পড়া ও লেখা ভাষাদক্ষতাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে প্রয়োজনের সময় যথাযথভাবে তা ব্যবহার করতে পারা। শুধু ছবির বই শিশুর শোনা ও বলা ভাষাদক্ষতা দুটি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। কেননা ছবি দেখে শিশু সাধারণত তার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাষায় ঘটনার বর্ণনা করে। যেমন-"দৈত্যের খিদে পেয়েছে" গল্পে -"দৈত্যের অনেক খিদে পেয়েছে। দৈত্য ব্যাগ খেয়ে ফেললো। দৈত্য চিকেন খেয়ে ফেললো।" এই ধরনের গল্প শোনার পর শিশু নিজে কল্পনা করে এবং নিজের ভাষায় বলতে থাকে "এবার দৈত্য টেবিল খেয়ে ফেললো, দৈত্য বোর্ড খেয়ে ফেললো, দৈত্য আমার ব্যাগ খেয়ে ফেললো" অর্থাৎ ছবিতে প্রকাশিত ভাষার সাথে শিশু তার কল্পনাকে একাকার করে দেখে। প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে গল্প শোনার ফলে সকল শিশুরই শোনা ও বলা ভাষাদক্ষতা দুটি সমভাবে বিকাশ লাভ করে। শিশুর এই অর্জন পরবর্তীতে পড়া ও লেখা ভাষাদক্ষতার বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাই প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ছবির বই বা ছবিতে গল্প বলার অনুশীলন ভাষাদক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শিশুর ভাষাদক্ষতা বিকাশে শিশুতোষ সাহিত্যের ভূমিকা

কোনো ভাষা শেখার অর্থ হলো শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখা। অর্থাৎ এই ভাষা-দক্ষতাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করে প্রয়োজনের সময় যথাযথভাবে তা ব্যবহার করতে পারা। ছবির বই শিশুর শোনা ও বলা ভাষা-দক্ষতা দুটি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। কেননা, ছবি দেখে শিশু সাধারণত তার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাষায় ঘটনার বর্ণনা দিতে পারে। যেমন : 'দৈত্যের খিদে পেয়েছে' গল্পে "দৈত্যের অনেক খিদে পেয়েছে। দৈত্য ব্যাগ খেয়ে ফেললো। দৈত্য চিকেন খেয়ে ফেললো।" গল্পের এটুকু শোনার পর শিশু নিজে কল্পনা করে এবং নিজের ভাষায় বলতে পারে–"এবার দৈত্য টেবিল খেয়ে ফেললো, দৈত্য বোর্ড খেয়ে ফেললো, দৈত্য আমার ব্যাগ খেয়ে ফেললো।" অর্থাৎ ছবিতে প্রকাশিত ভাষার সাথে শিশু তার কল্পনাকে একাকার করে দেখে। প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে গল্প শোনার ফলে সকল শিশুরই শোনা ও বলা ভাষা-দক্ষতা দুটি সমভাবে বিকাশ লাভ করে। শিশুর এই অর্জন, পড়া ও লেখা, পরবর্তীতে ভাষা-দক্ষতার বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাই প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ছবির বই, ছড়ার বই বা ছবিতে গল্প বলার অনুশীলন ভাষা-দক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লেখক পরিচিতি

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ, সৃজনশীলতার উন্মেষ ও শেখার ক্ষেত্রে একটি আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিশুর উপযোগী সাহিত্য, অর্থাৎ শিশুতোষ সাহিত্যের যে নানা সম্ভার সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার মধ্যে **ছড়া** ও **ছবিতে গল্প পড়া** একটি বিশেষ আয়োজন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এ লক্ষ্যে আমার বই এবং শিক্ষক সহায়িকায় অনেক মজার মজার ছড়া ও গল্প সংযোজন করেছে। বর্ণিত ছড়া ও ছবিতে গল্প এ স্তরের শিখন শেখানো সামগ্রী থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বোতলে ইঁদুরছানা, সোনামণি, বছর ঘুরে দেখা ও যদু মাস্টার গল্পগুলো প্রকাশ করে। এ প্রকাশনায় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ। ইউনিসেফ নিয়োজিত পরামর্শক অধ্যাপক শওকত আলম সিদ্দিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর শ্যামলী আকবর এরূপ ১৮টি গল্পের বই রচনা ও সম্পাদনায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন। এ ছাড়াও লেখক হিসেবে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর শুভাশিস চক্রবর্তী, উত্তমকুমার ধর, নিরেশচন্দ্র মুখার্জি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শহীদুল্লাহ শরীফ দায়িত্ব পালন করেন। বর্ণিত লেখকদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণসামগ্রী প্রণয়নের সঙ্গে দীর্ঘ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। গল্পের বইগুলো সৃজনশীল ও শিশুতোষ রচনা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য সম্পূরক পঠন-উপকরণ হিসেবে প্রকাশ করেছে।

ছড়া ও ছবিতে গল্প পড়া
ছড়া

সিংহ মামা সিংহ মামা
করছ তুমি কি
এই দেখ না কেমন তোমার
ছবি এঁকেছি

ছবি পড়া

মূলভাব

প্রদত্ত ছড়া ও ছবিতে গল্পটি প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মজা পাওয়ার জন্যই সংযোজন করা হয়েছে। ছড়ার কোনো নাম নেই। ছড়াটি শুনে শিশু নিজেই এর একটি নাম দেবে। ছড়াটি শোনার পাশাপাশি কল্পনার জগতে প্রবেশ করে নিজেই রং-তুলি নিয়ে কল্পনার জগৎ ঘুরে সৃজনশীল ভুবনে প্রবেশ করবে। ছবি পড়া শুধু ছবিই, কোনও লেখা নেই। ছবিগুলো এমন, যেন সেখানে অনেক কথা লুকিয়ে আছে। এই লুকানো কথা একেকজনের চিন্তা বা কল্পনা। তাই এ ধরনের ছবির বই শিশুর কল্পনার জগৎকে অনেক বেশি প্রসারিত করে।

বোতলে ইঁদুর ছানা

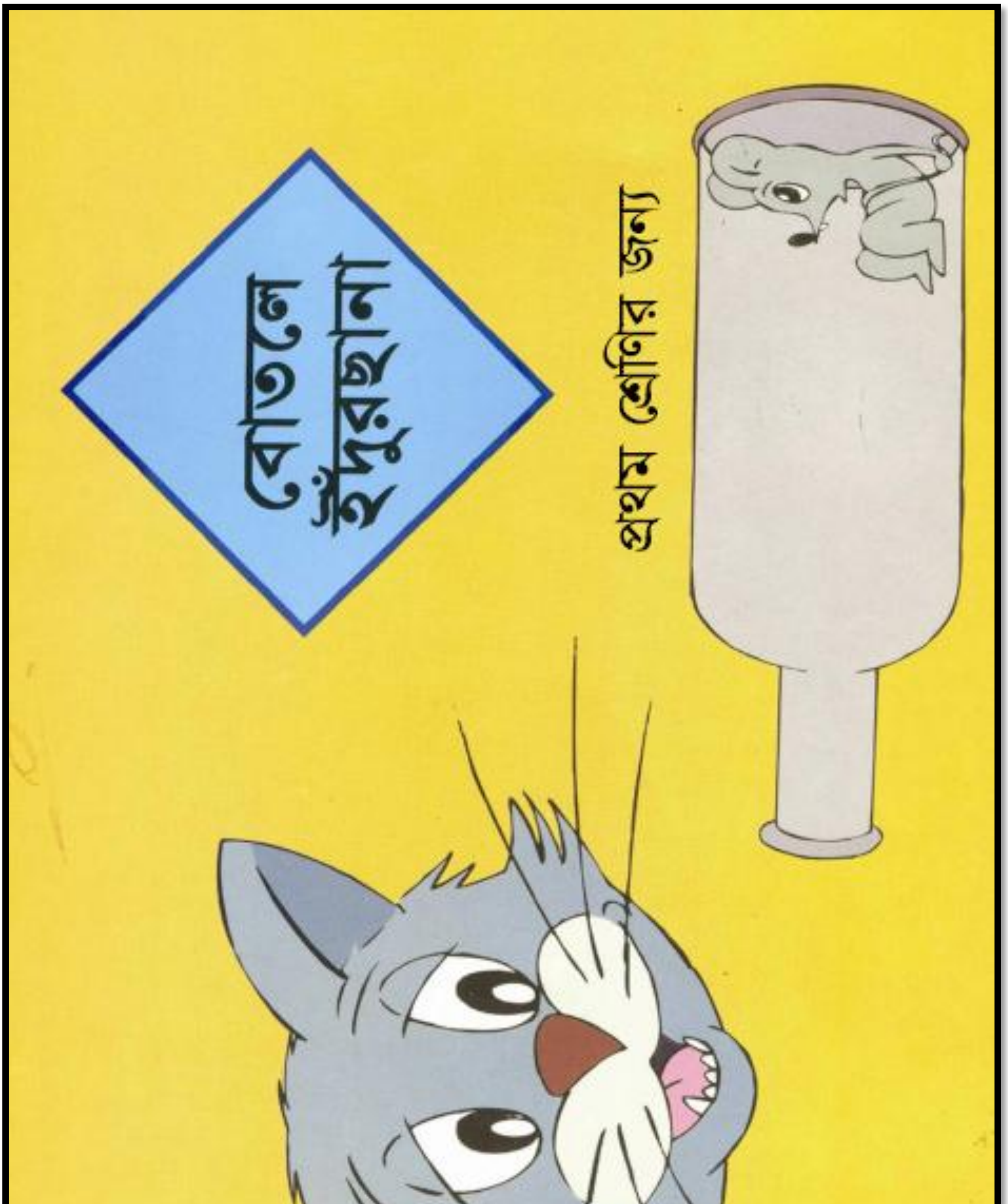

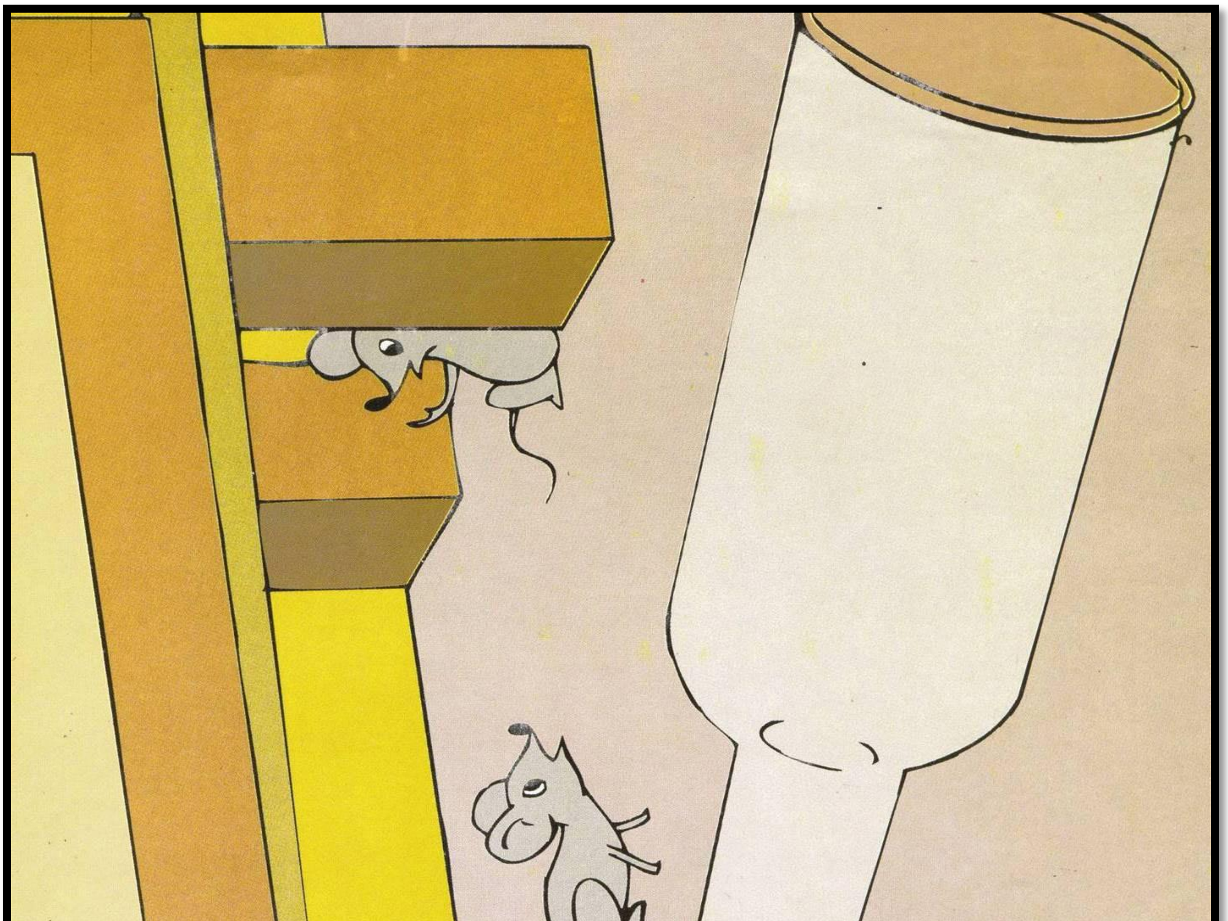

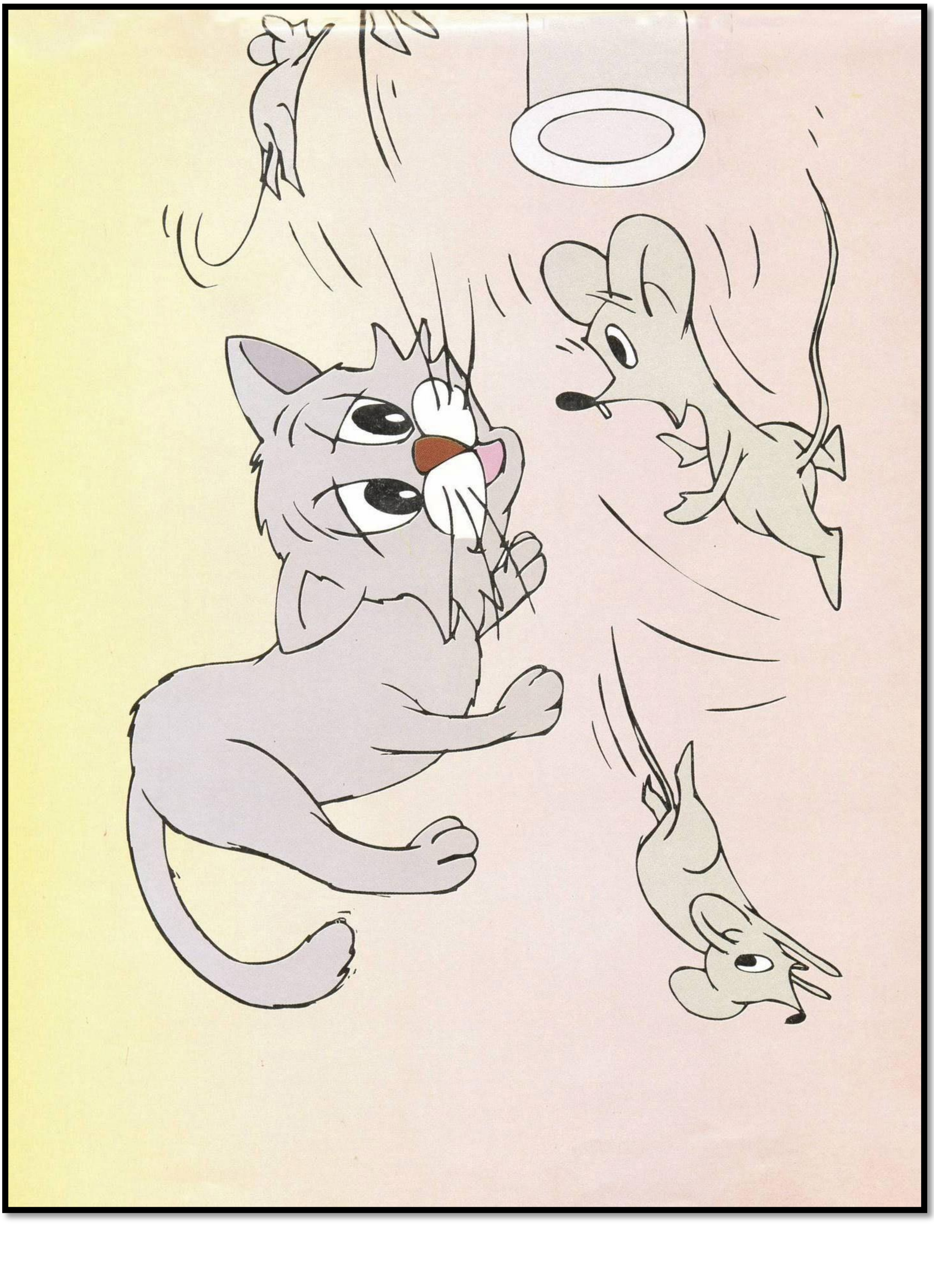

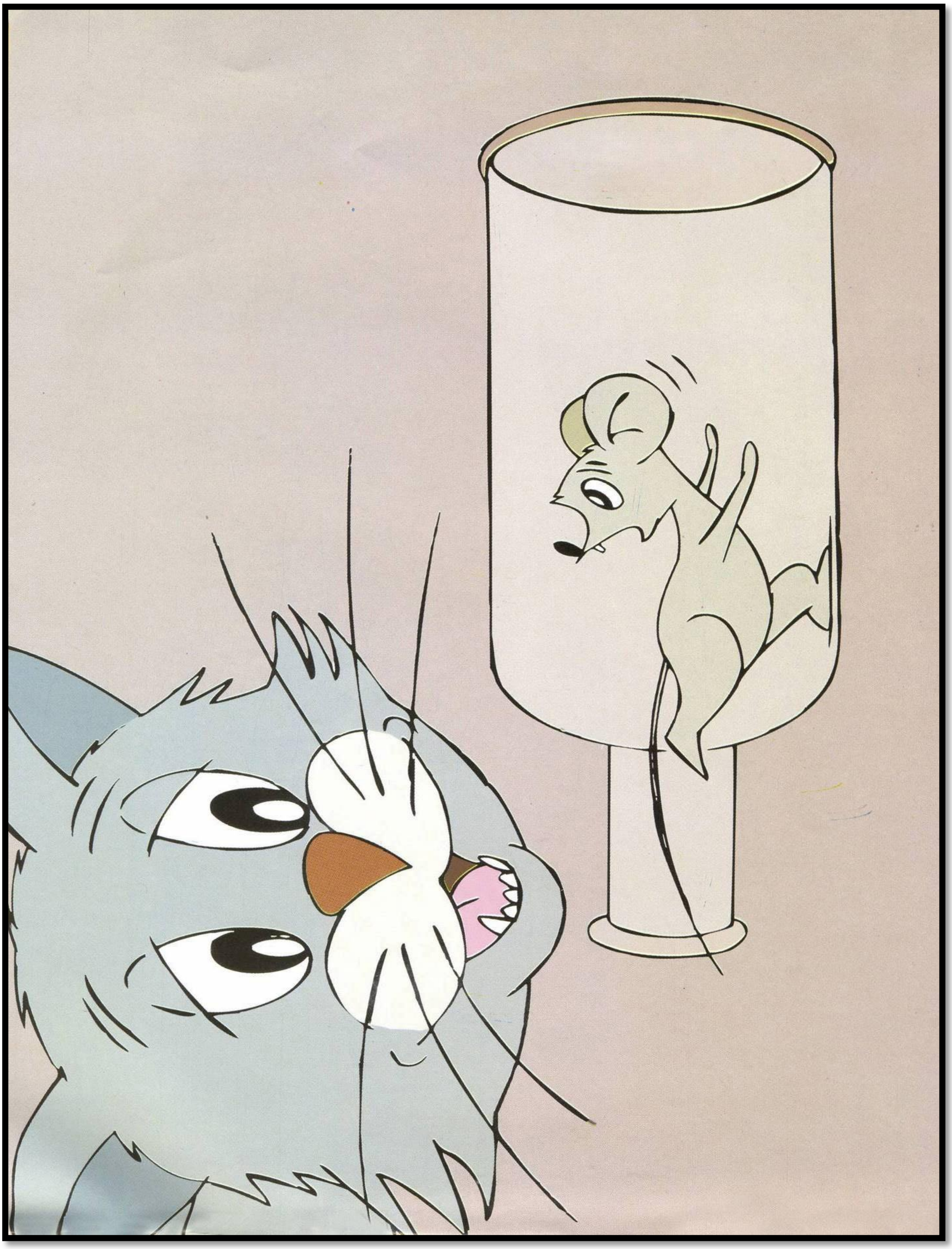

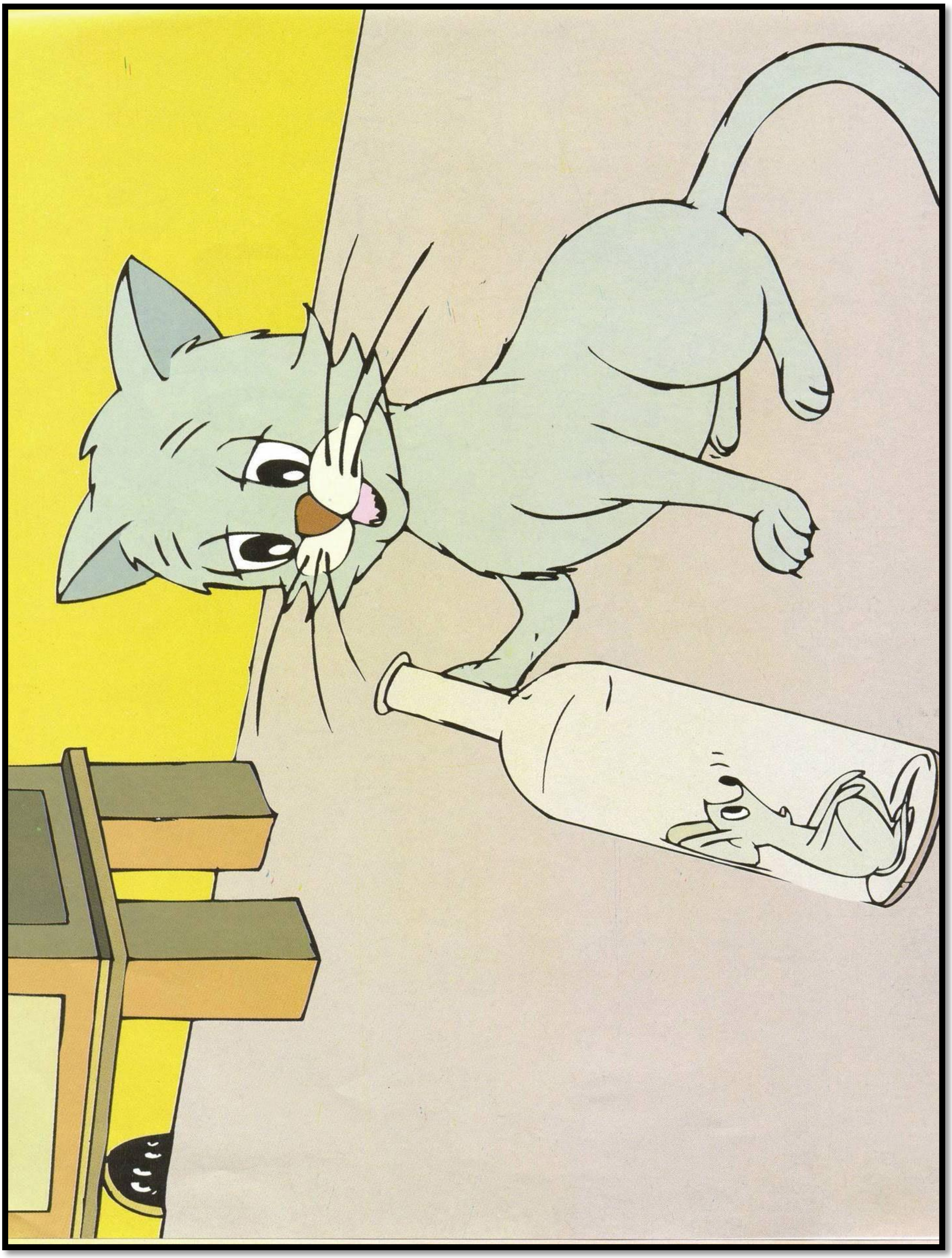

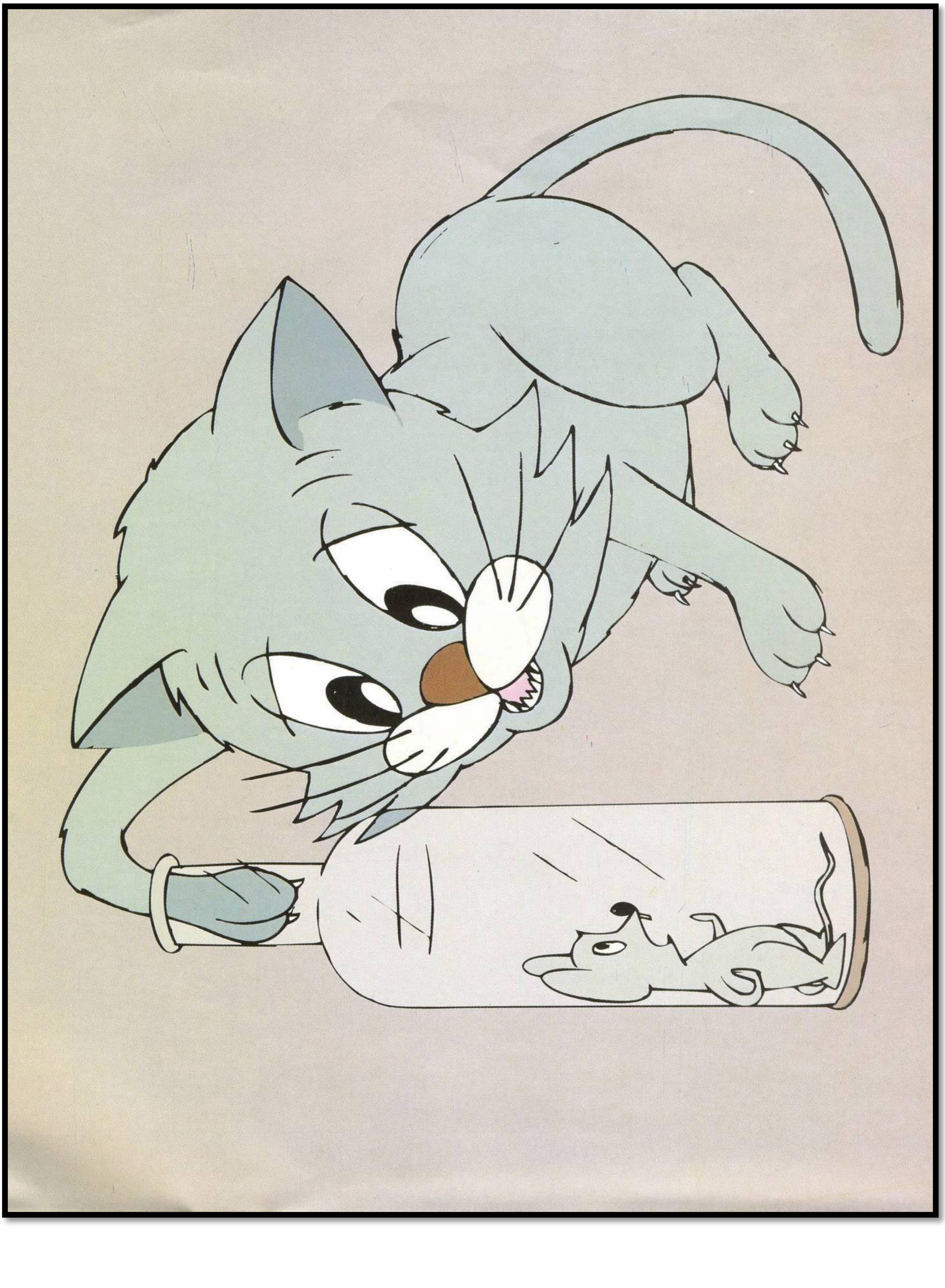

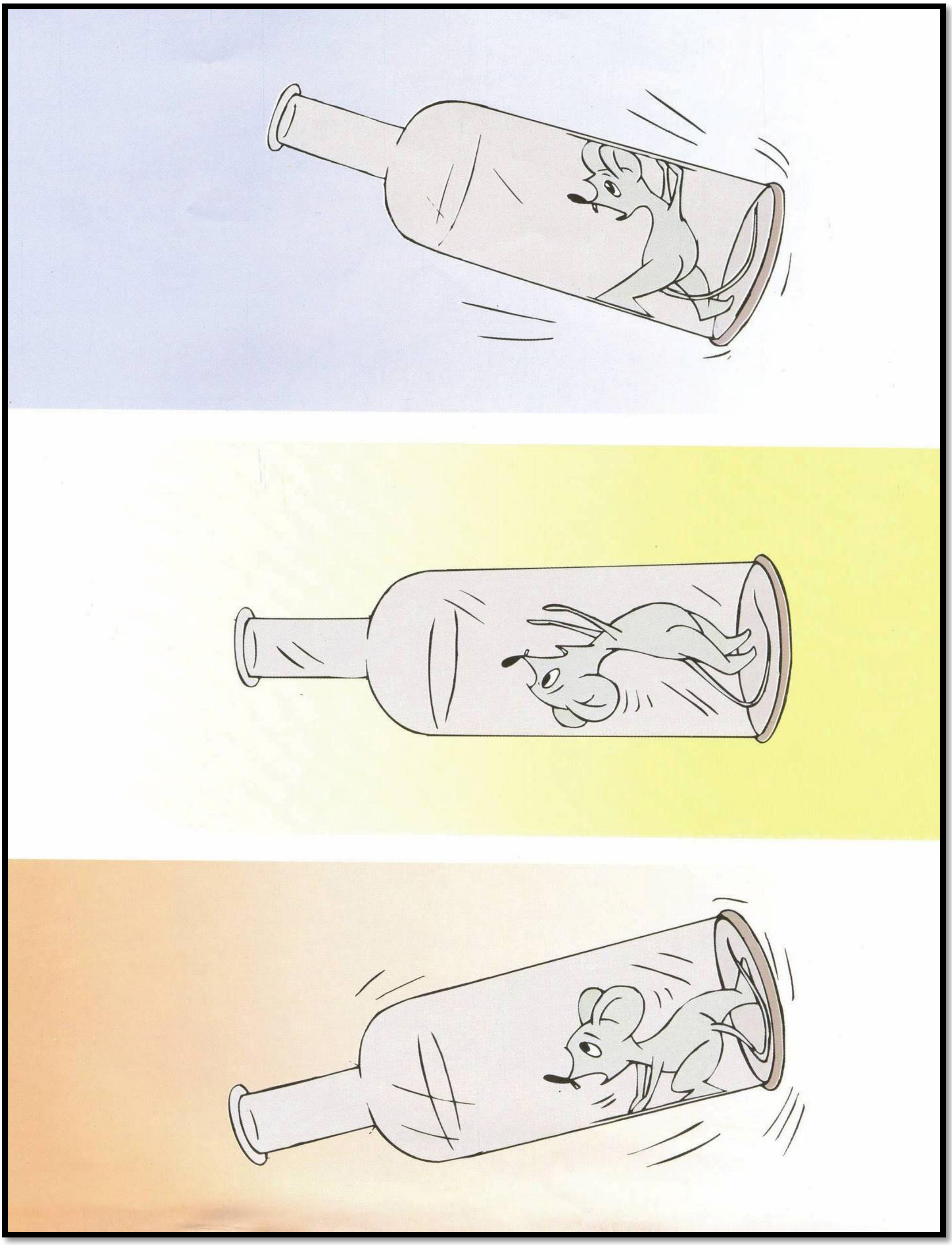

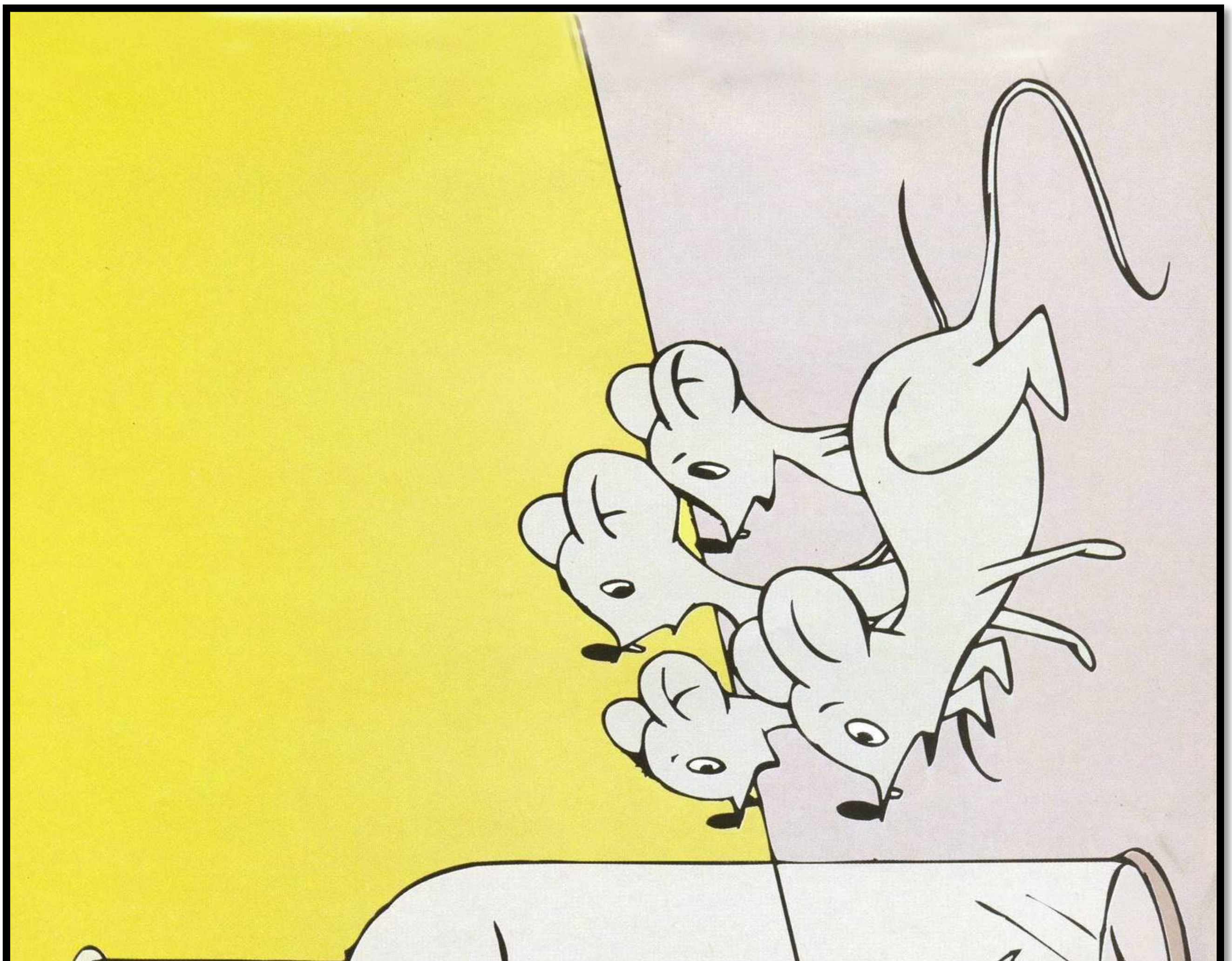

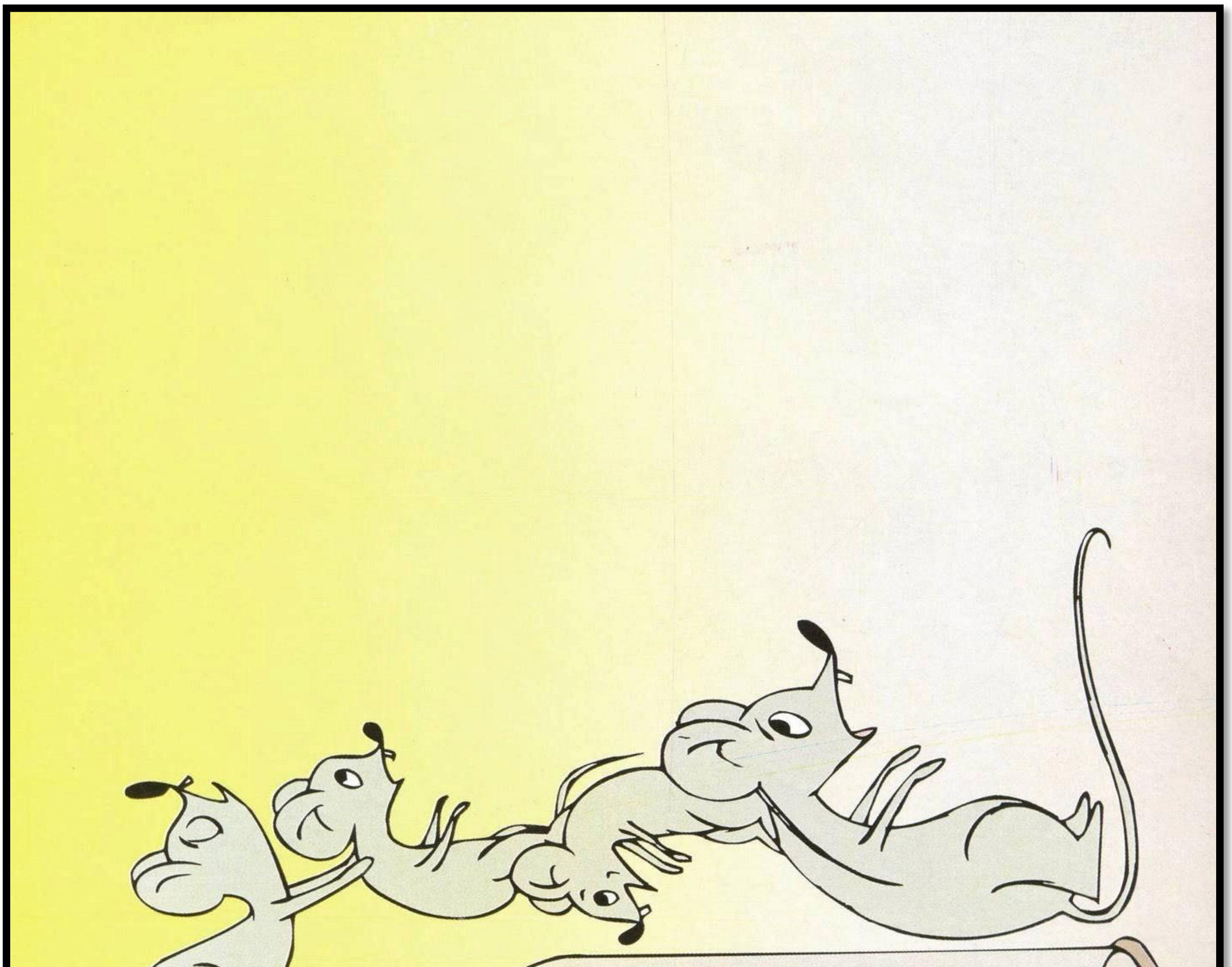

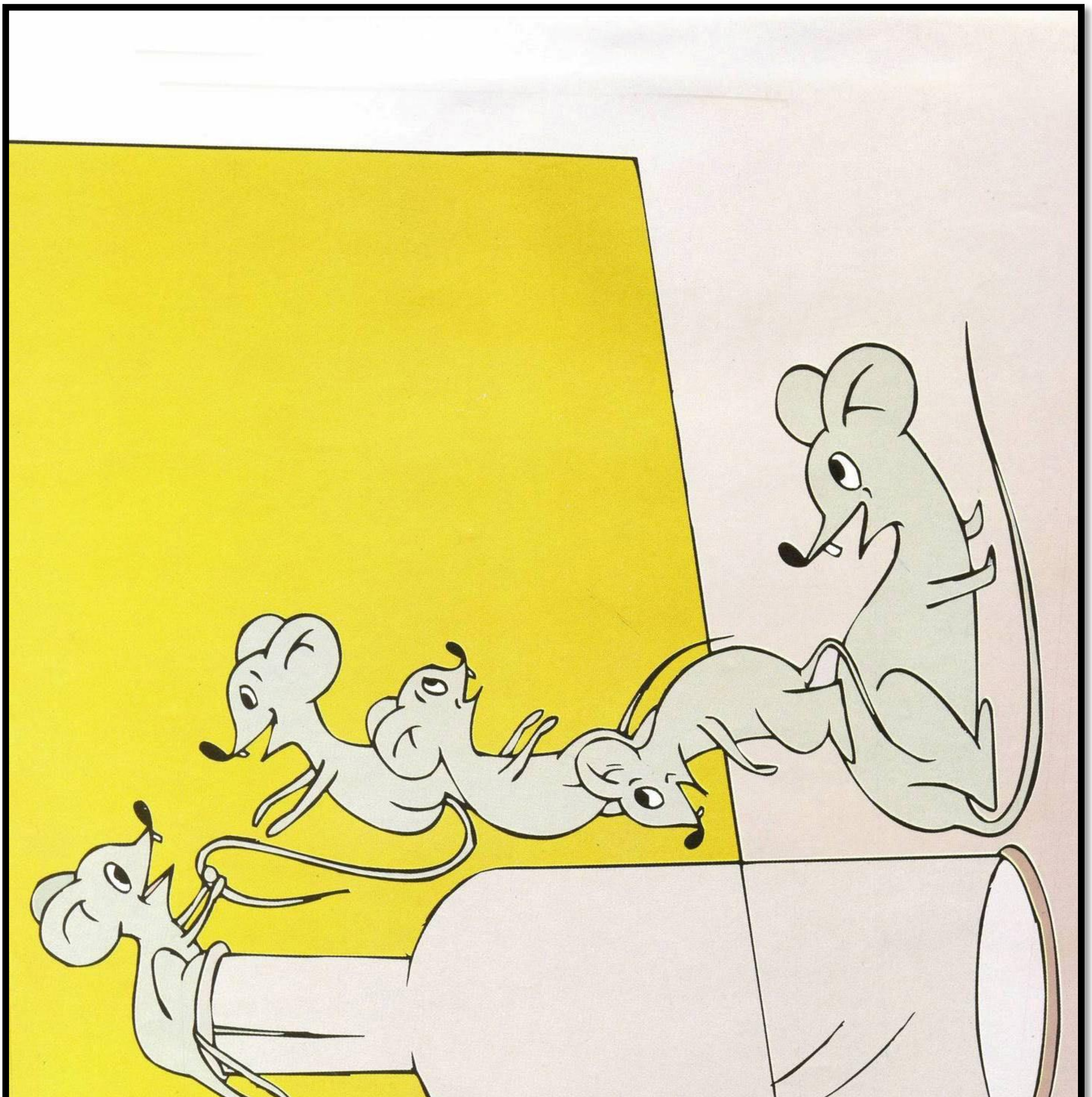

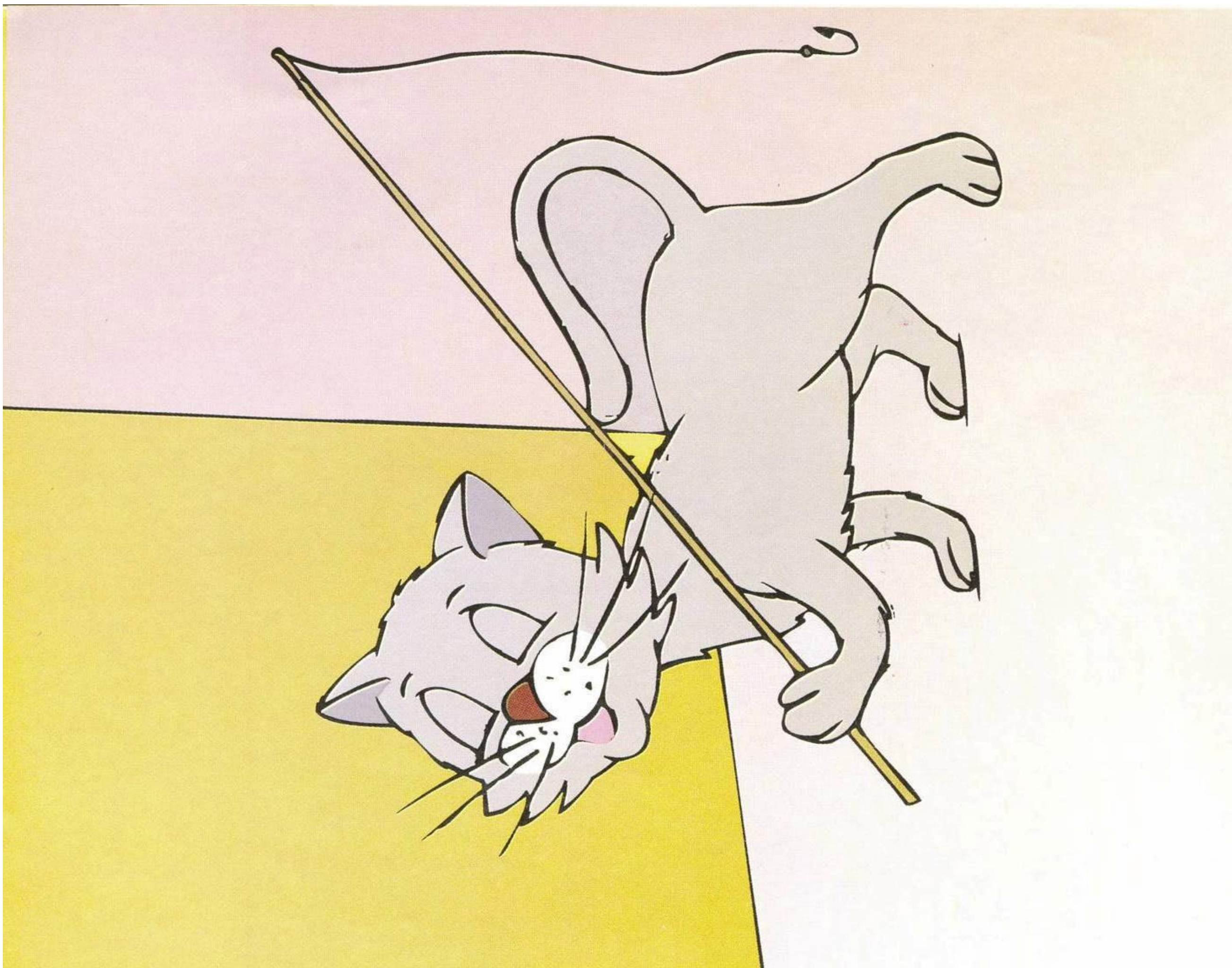

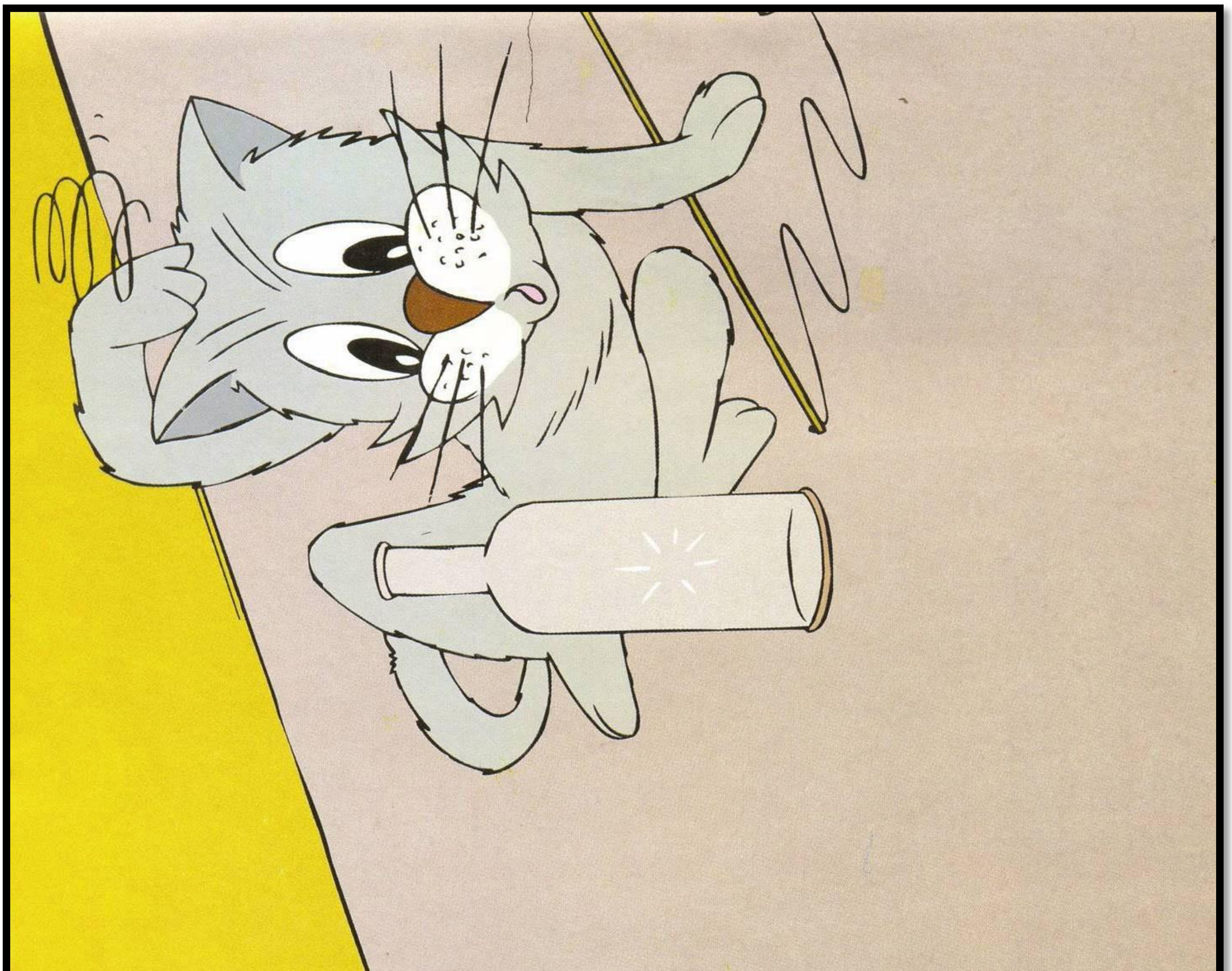

মূলভাব

'বোতলে ইঁদুরছানা' বইটি প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ভালো লাগা, মজা পাওয়ার জন্য তৈরি ছবির বই। ডিজাইন ও ছবি দিয়েই গল্পটি তৈরি করা হয়েছে। কোনো লেখা নেই। কিন্তু ছবিগুলো অনেক কথা বলে। ছবিগুলো এমন, যেন সেখানে অনেক কথা লুকিয়ে আছে। এই লুকানো কথা একেকজনের চিন্তা বা কল্পনা। প্রতিটি মানুষই কল্পনাপ্রবণ। তার মধ্যে শিশুরা একটু বেশিই কল্পনাজগতে বাস করে। তাই এ ধরনের ছবির বই শিশুর কল্পনার জগৎকে অনেক বেশি প্রসারিত করে। এসব ছবি দেখে তারা বিভিন্ন ধরনের চিন্তা করে, একে অন্যের সঙ্গে অনেক কথা বলে। এগুলো তাদের কল্পনা। ছবি দেখে শিশু সাধারণত তার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাষায় ঘটনার বর্ণনা করে। দেখা যায়, এই গল্প বলা প্রত্যেক শিশুর জন্য ভিন্ন। শ্রেণিকক্ষে একজন শিশু যখন ছবি দেখে গল্প বলে, তখন অন্য শিশুরা ঐ গল্প শোনার সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষে এ কাজটি করলে সব শিশুরই শোনা ও বলা ভাষা-দক্ষতা দুটি সমভাবে বিকশিত হবে। শিশুর এই দক্ষতা অর্জন পরবর্তীকালে পড়া ও লেখা ভাষা-দক্ষতার বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাই প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ছবির বই বা ছবিতে গল্প বলার অনুশীলন ভাষাদক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

'বোতলে ইঁদুরছানা' গল্পে বিড়ালের তাড়া খেয়ে একটি ইঁদুরছানার বোতলে ঢুকে যাওয়া এবং মা-ইঁদুরের বুদ্ধির জোরে বের হয়ে আসার ঘটনা পরিস্ফুট হয়েছে। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠাজুড়ে আকর্ষণীয় ছবি রয়েছে। এই ছবিগুলো এমনভাবে আঁকা, যার ভাবনা শিশুদের সহজে আকৃষ্ট করবে।

ভোরে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।

সকালে ও রাতে
আমি ভালো করে দাঁত মাজি।

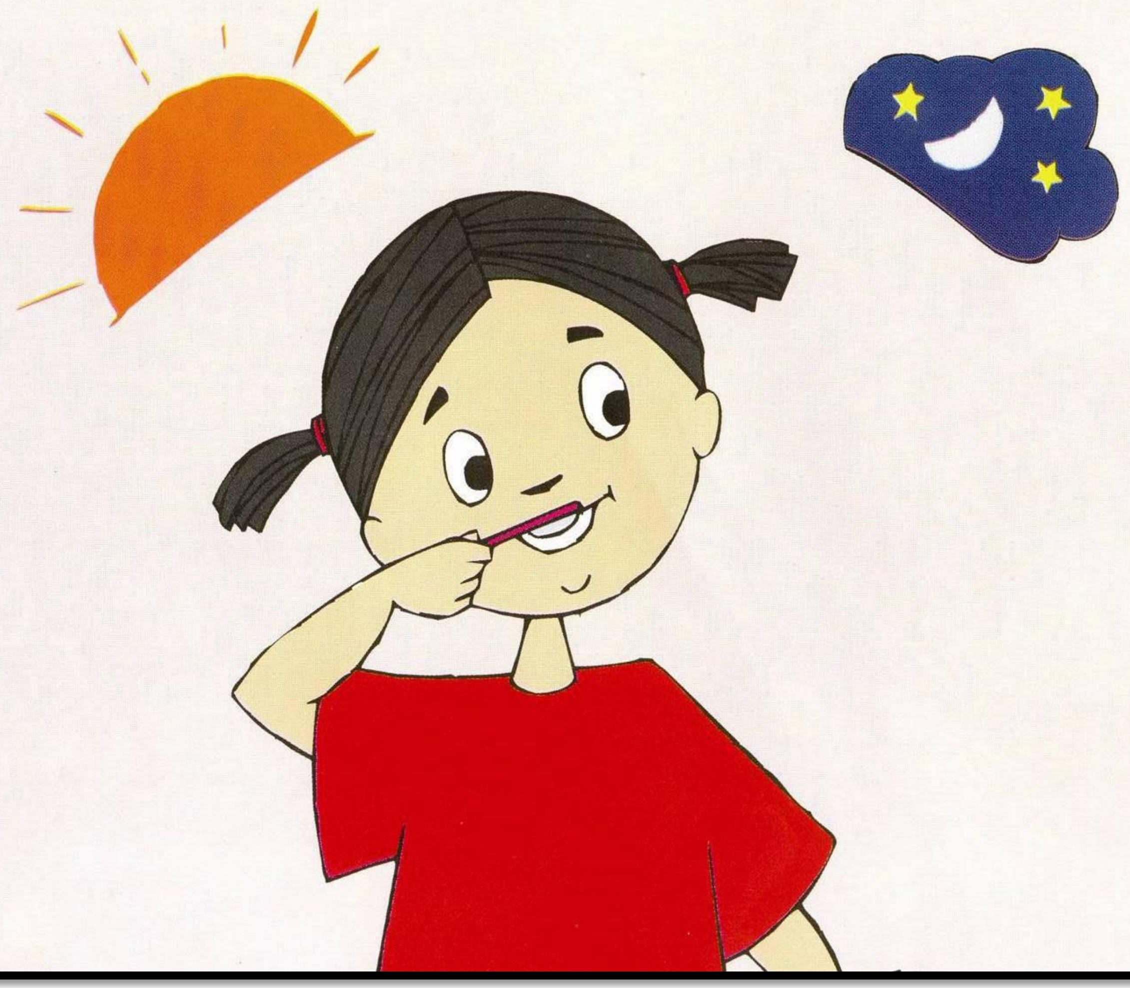

খেতে বসার আগে আমি সব সময়
সাবান দিয়ে হাত ধুই।

আমি সাবধানে পথ চলি।

শিক্ষক ক্লাসের পড়া বলতে বললে
আমি ঠিকমতো বলি।

আমি যেখানে-সেখানে
খোসা বা কাগজের টুকরো ফেলি না।

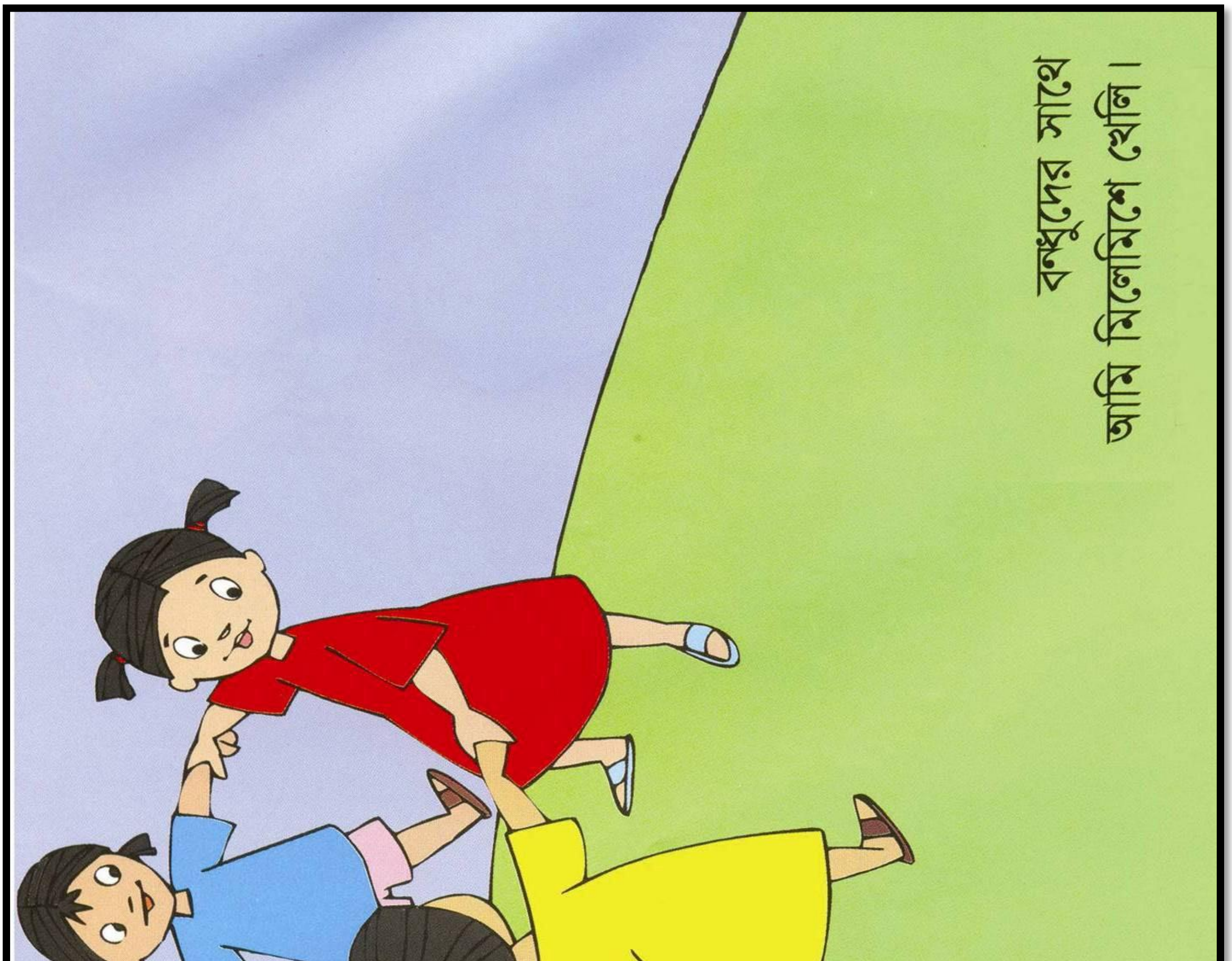
বন্ধুদের সাথে
আমি মিলেমিশে খেলি।

স্কুল ছুটির সাথে সাথে
আমি বাড়ি ফিরে আসি।
১১

বিকেলে আমি
বাড়ির উঠোনের ফুলগাছে পানি দিই।

আমার খেলনাগুলো
আমি নিজেই গুছিয়ে রাখি।

সন্ধ্যা হলেই আমি পড়তে বসি।

রাতে শুতে যাবার আগে
আমি আমার স্কুলের বইখাতা গুছিয়ে রাখি।

সবাই বলে আমি সোনামনি।

মূলভাব

'সোনামনি' গল্পটি প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত হয়েছে।

আকর্ষণীয় ছবিযুক্ত গল্পের বই শিশুকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তাই পৃথিবীর সর্বত্র শিশুতোষ বইগুলো মনোলোভা ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। রঙের বর্ণিল ছটা ও অবয়বের বৈচিত্র্য শিশুমনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এরই আকর্ষণে শিশু বইয়ের বর্ণনা শুনতে ও পড়তে অনুপ্রাণিত হয়। ছবির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ঘটনা বুঝতে চায়। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব, নিচের শ্রেণির জন্য রচিত বইগুলোতে তুলনামূলকভাবে ছবির সংখ্যা ও পরিসর বেশি থাকে এবং ছবির তুলনায় লেখার কলেবর কম। এর মূল কারণ ধীরে ধীরে শিশুকে ভাষার বিমূর্ত রূপ থেকে মূর্ত রূপের দিকে নিয়ে যাওয়া।

'সোনামনি' গল্পে একটি ছোট্ট মেয়ের সারাদিনের নানা ঘটনা পরিস্ফুট হয়েছে। পৃষ্ঠা জুড়ে ছবি ও এক দুই লাইনের ছোট ছোট বাক্যের বর্ণনা শিশুর মনোযোগ ও আগ্রহ দুইই ধরে রাখতে সক্ষম। ভাষায় রচিত গল্পের সঙ্গে ছবির গল্পের পার্থক্য হচ্ছে–ছবির গল্পে একটি বা দুটি বাক্যের কথা থাকে। এখানে 'সোনামনি' গল্পটিতে শিশুর দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি বেশ কিছু ভালো কাজের কথা বলা হয়েছে। ভালো কাজ করলে সবাই যে আদর করে, তাও পরোক্ষভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে গল্পটিতে। গল্পের শেষ বাক্যে এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে–'সবাই বলে আমি সোনামনি'।

এই গল্পে কিছু বাক্যাংশেরও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেমন – আমি এটা করি, সেটা করি, এইসব ইত্যাদি। ভাষা শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে বাক্য কাঠামোর এই ধরনের পুনরাবৃত্তি শিশুকে একই ধরনের বাক্য বারবার শোনার সুযোগ করে দেয়। ফলে শিশুমনে বাক্যের কাঠামো স্থায়ী হয় এবং অনুরূপ বাক্য ব্যবহারে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। শুনে ও পড়ে এভাবে অর্জিত ভাষা-অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তার বলা ও লেখার ভাষাদক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বছর ঘুরে দেখা

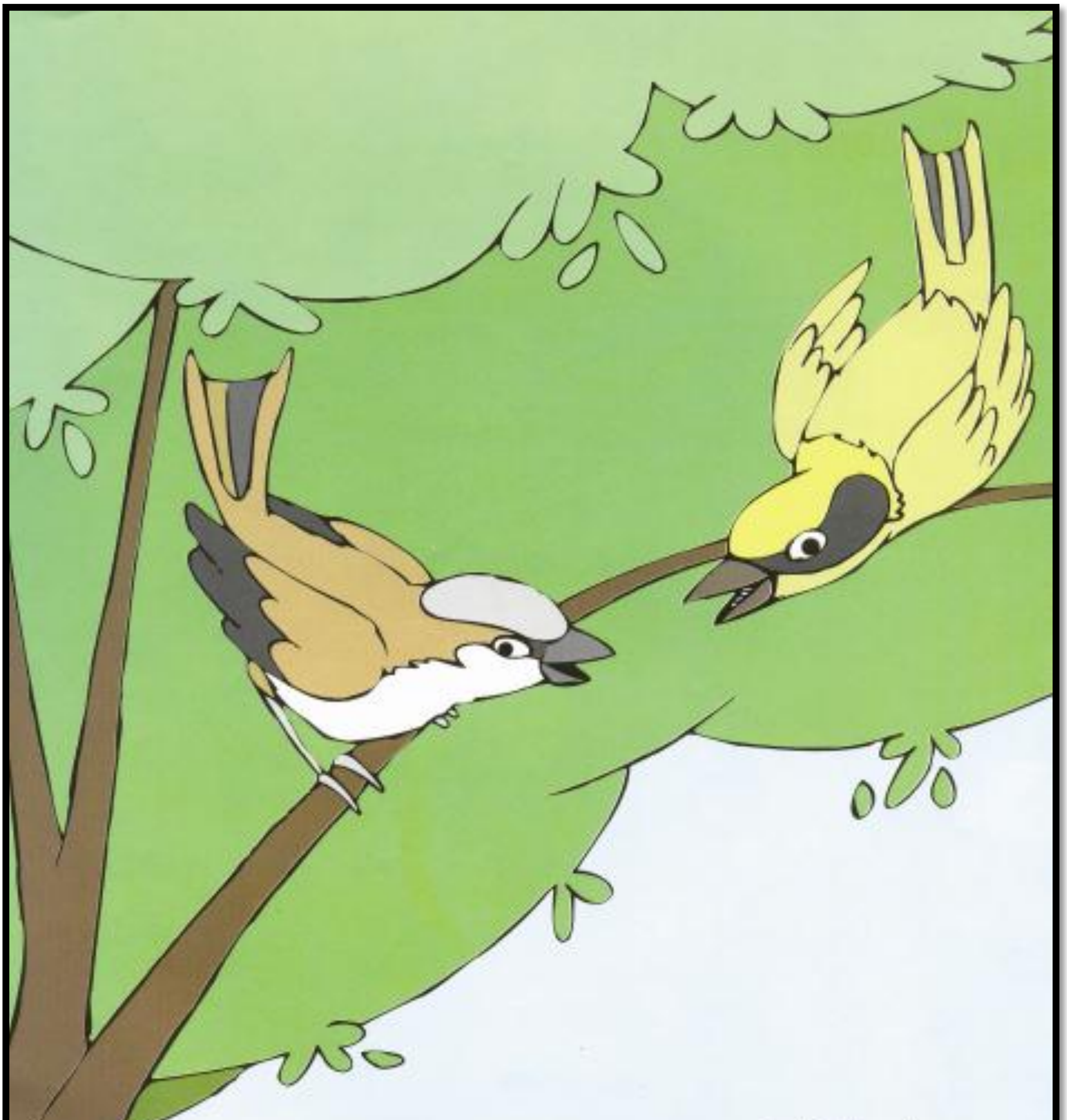

বাবুই গান গায়।
ডালে ডালে নেচে বেড়ায়। হাসি-খুশিতে দিন কাটায়।
একদিন বাবুই চড়ুইকে বলল, চল বেড়িয়ে আসি।
একই জায়গা আর ভাল লাগে না। চড়ুই রাজি হল।
দুজনে উড়ছে তো উড়ছেই। পথ যেন আর আর ফুরোয় না।

যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে গেল।
চারপাশে কী ভীষণ রোদ! বাবুই-চড়ুই গরমে ঘামতে লাগল।
সামনে পড়ল এক বাগান । বাগানে এসে ওরা বসল।
বাগানে অনেক ফল।
আম, জাম, লিচু,
কলা, কাঁঠাল আরও কত কি।

বাবুই-এর মনে পড়ল, এখন গ্রীষ্মকাল।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। এই দুই মাস ফলের মাস।

ওরা আবার উড়ে চলল।
আকাশে ঘন কালো মেঘ। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। কী ভীষণ বৃষ্টি। এক কাক তো ভিজে একশেষ। ডালে বসে কাঁপছে। চড়ুই বলল, কাঁপছ কেন? কাক বলল, বৃষ্টিতে ভিজে বোধহয় জ্বর এল।
কাকের কষ্ট দেখে বাবুই-চড়ুই এগিয়ে এল।
তিনজনে ডালে বসে বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগল।

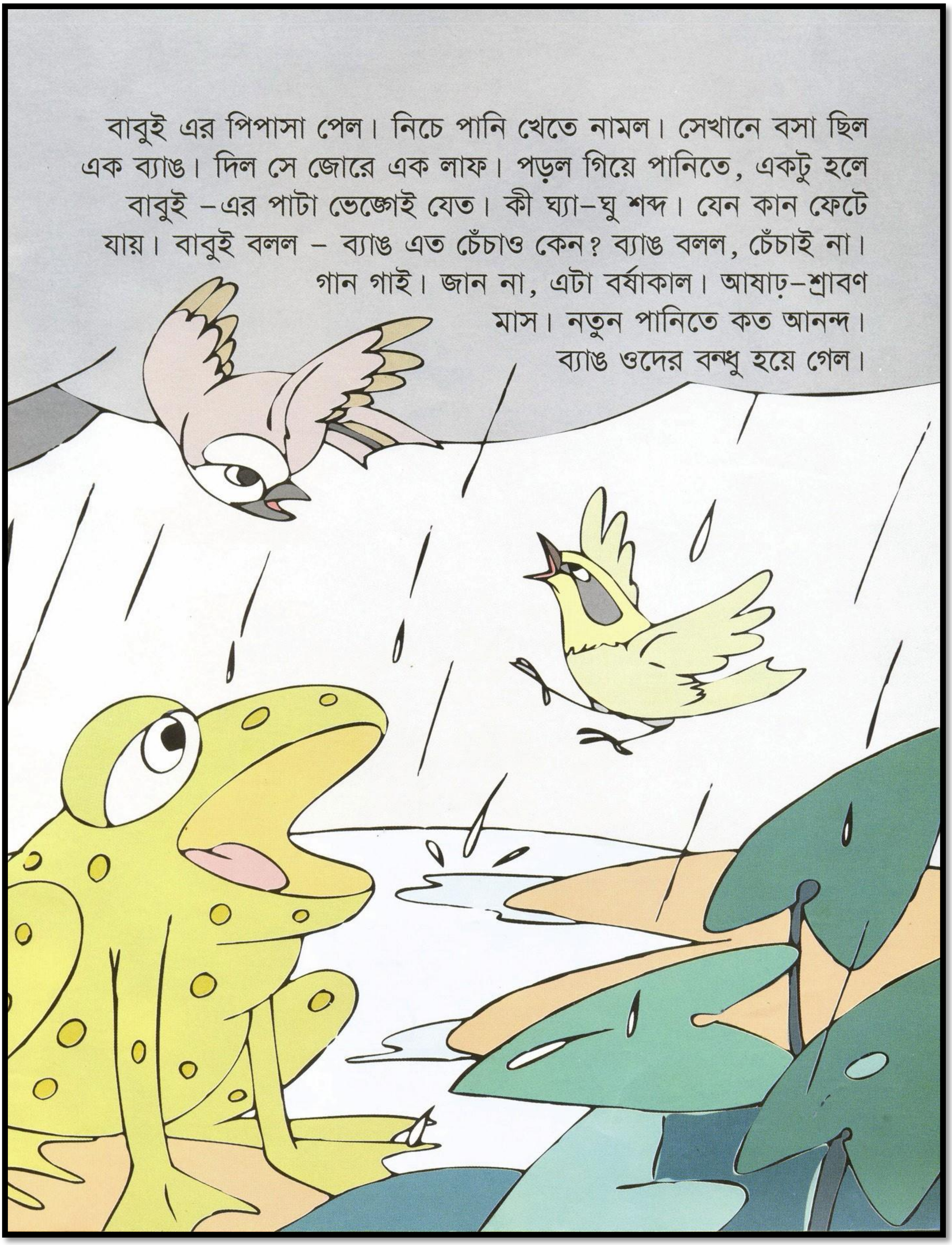
বাবুই এর পিপাসা পেল। নিচে পানি খেতে নামল। সেখানে বসা ছিল এক ব্যাঙ। দিল সে জোরে এক লাফ। পড়ল গিয়ে পানিতে, একটু হলে বাবুই –এর পাটা ভেজ্ঞোই যেত। কী ঘ্যা–ঘু শব্দ। যেন কান ফেটে যায়। বাবুই বলল – ব্যাঙ এত চেঁচাও কেন? ব্যাঙ বলল, চেঁচাই না। গান গাই। জান না, এটা বর্ষাকাল। আষাঢ়–শ্রাবণ মাস। নতুন পানিতে কত আনন্দ। ব্যাঙ ওদের বন্ধু হয়ে গেল।

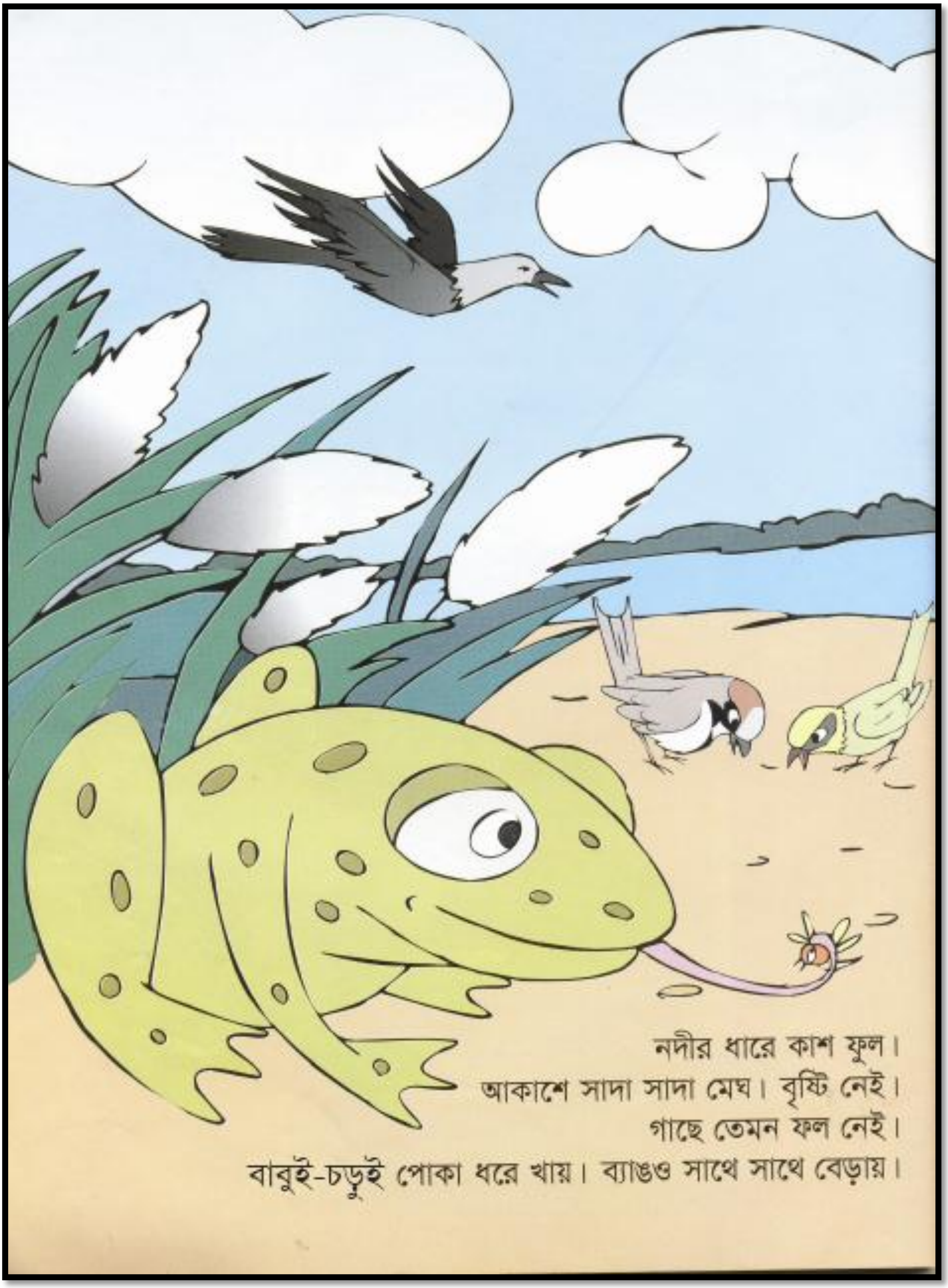
নদীর ধারে কাশ ফুল।
আকাশে সাদা সাদা মেঘ। বৃষ্টি নেই।
গাছে তেমন ফল নেই।
বাবুই-চড়ুই পোকা ধরে খায়। ব্যাঙও সাথে সাথে বেড়ায়।

ওরা মাটিতে নামলে ব্যাঙ কথা বলে।
কাক কোথায় যেন চলে গেছে। চড়ুই বলল, কী সুন্দর
নীল আকাশ ! সকালে শিউলি ফুলের গন্ধ।
ব্যাঙ বলল, এখন যে শরৎকাল।
ভাদ্র-আশ্বিন মাস।

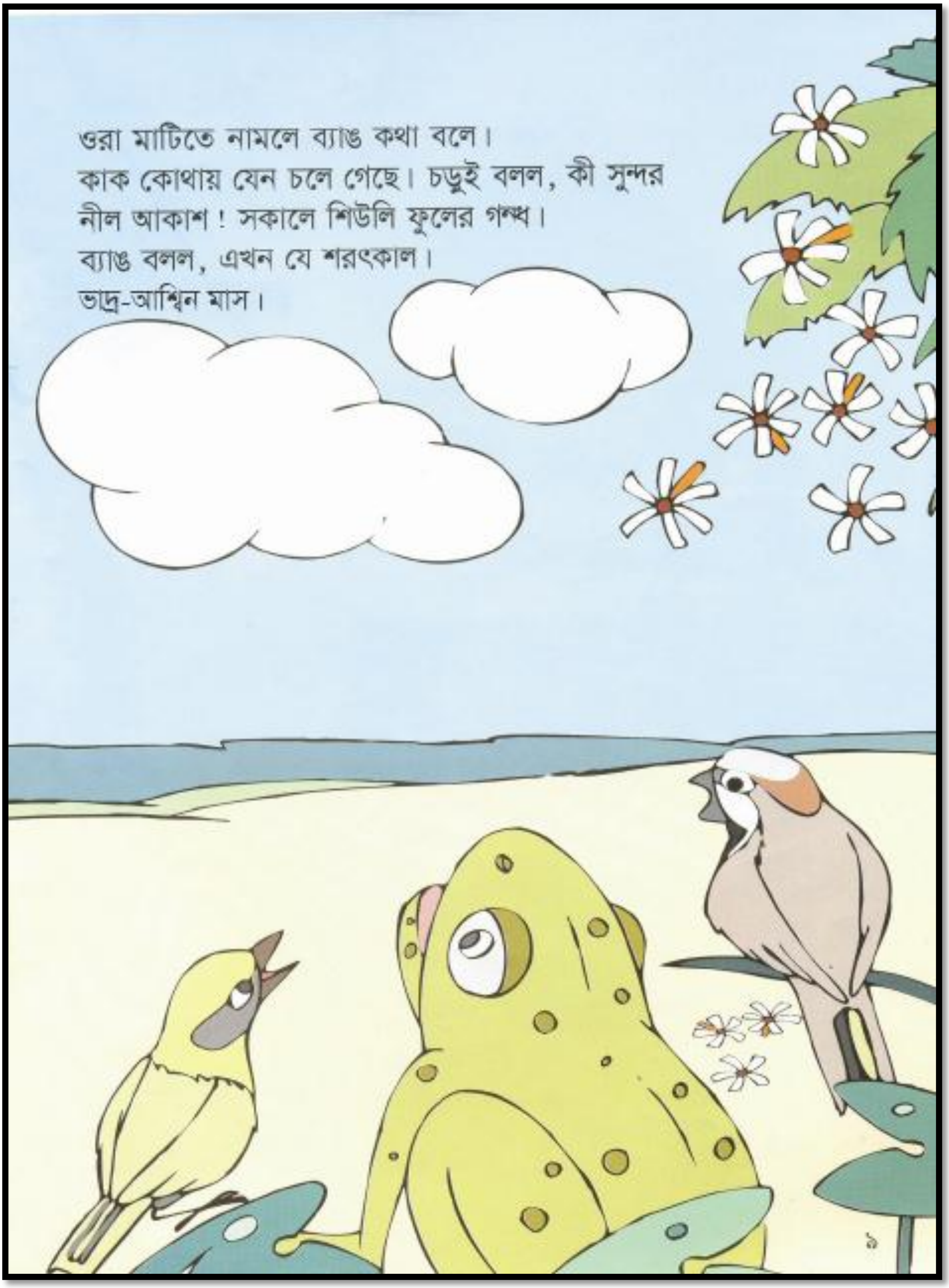

মাঠে মাঠে সোনালি ধান। কৃষকেরা ধান কাটে আর গান গায়।
কৃষাণীরা ঢেঁকিতে ধান ভানে
বাবুই-চড়ুইয়ের খাবারের অভাব নেই।

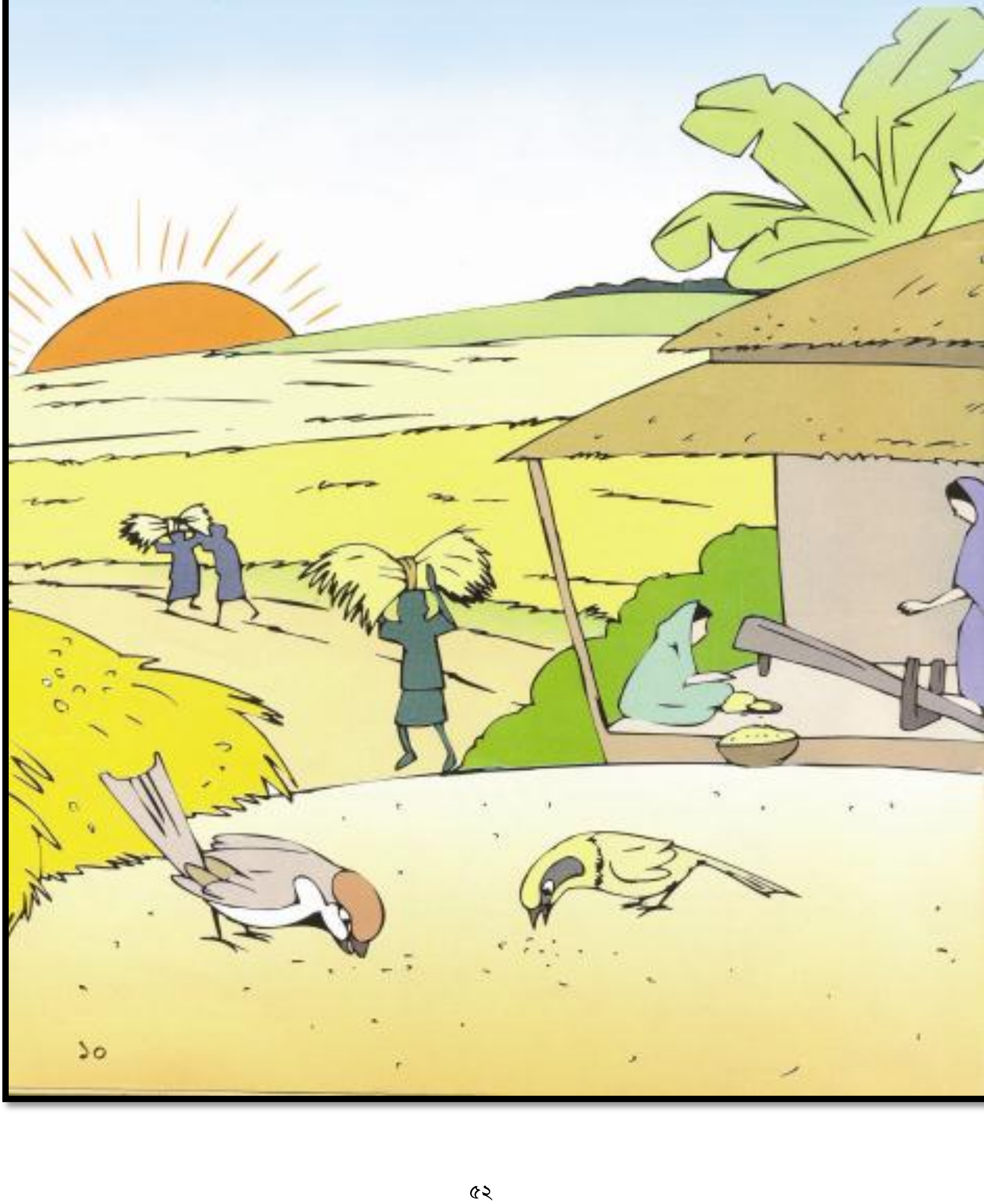

কারও বাড়ি গেলেও তাড়িয়ে দেয় না। সবার মনে সুখ। বাবুই বলল, এখন হেমন্তকাল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস। এখন নবান্ন উৎসব হবে। বাবুই-চড়ুই টুনটুনির বাড়িতে নবান্নের দাওয়া খেতে গেল।

বাবই-চড়ুই এক বিলের ধারে বসল। বিলে সব নতুন পাখি। ওরা চেনে না। তাই পরিচিত হতে গেল। চড়ুই এগিয়ে গেল। বলল, তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই? একটি বড় পাখি এগিয়ে এল। বলল, অনেক দূর। তোমরা চিনবে না। সে ভিন্ দেশ। এত বড় পাখি ওরা কখনও দেখেনি। তাই ভয় পেয়েছিল। নতুন পাখিদের ব্যবহার খুবই ভাল। বলল, আমাদের দেশে এখন খুব শীত। তাই এসেছি। শীত ফুরোলে চলে যাব।

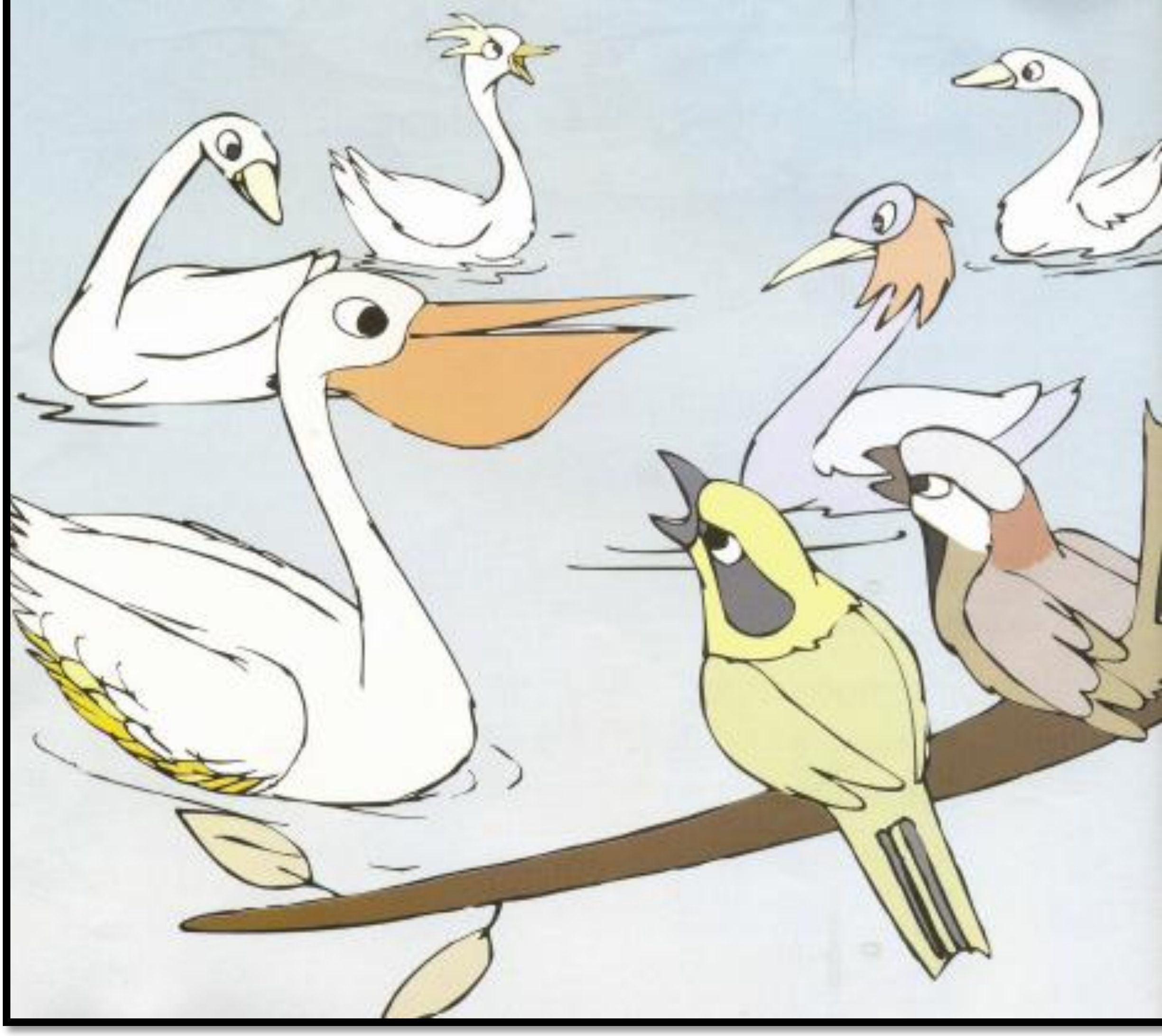

ওরা আবার উড়তে শুরু করল। শীত নেই। চারদিকে হলুদ সরষে
ক্ষেত। গাছে গাছে নতুন পাতা। সুন্দর ফুল ফুটেছে।
মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু নিচ্ছে।
কোকিলের কী মন–মাতানো গান।
বাবুই–এর মধুর গানে
চড়ুই –এর ঘুম ভাঙে।
সবাই গান গায়।

কাকেরও ইচ্ছে হল – গান গায়।
হঠাৎ কাক জোরে কা কা করে ডেকে উঠল।
শুনে চড়ুই পেল ভয়। ডাল ভেঙে প্রায় পড়েই
গেছিল। বাবুই বলল, ভয় পেয়ো না।
এখন বসন্ত কাল। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস।
তাই তো এত এত আনন্দ।

চড়ুই বলল, চল ফিরে যাই।
অনেক তো বেড়ালাম।
ওরা উড়ছে আর বলছে–
কী মধুর এ দেশ ভাইরে, কী মজার এই দেশ।
বছর ঘুরে দেখলাম এর রূপ আর রঙের নানান খেলা।
যার রূপের যে শেষ নাইরে।

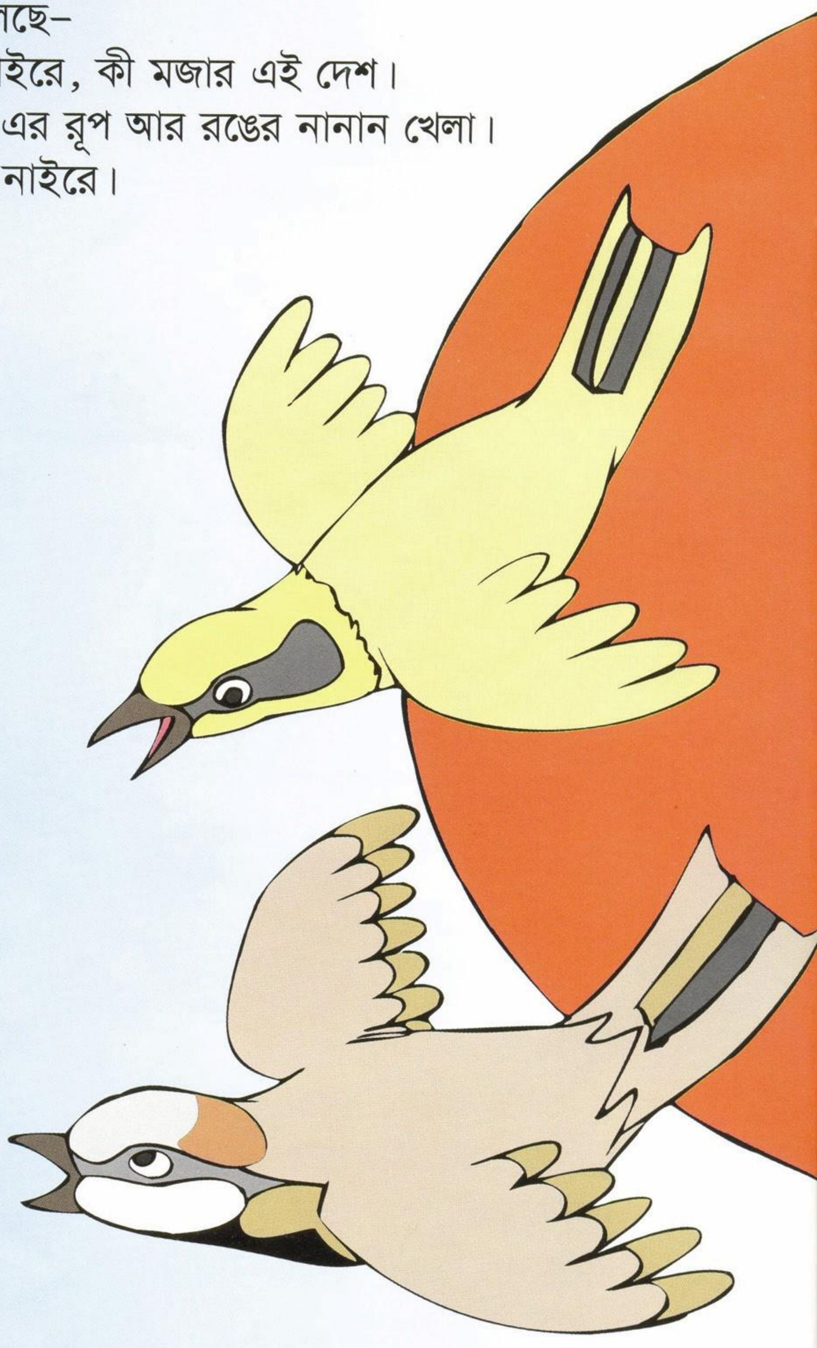

মূলভাব

'বছর ঘুরে দেখা' গল্পটি দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সহজ ভাষায় লেখা। গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র হচ্ছে পাখি। তারা নিজেদের প্রয়োজনে ইচ্ছেমতো দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে তারা নানা ধরনের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় তারা নতুন নতুন ফুল, ফল, খাবারের রূপ, রস, স্বাদ পায়। পাখি শিশুদের একটা পছন্দের প্রাণী। এই গল্পে পাখির কথোপকথনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ষড়ঋতুর রূপ-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একেকটি স্থানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে। এই ধরনের গল্প শোনার মাধ্যমে শিশুরাও কল্পনায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ পায়। এই গল্পে অত্যন্ত সহজ ভাষায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুটি শিশুদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য, শিশুরা যাতে এই গল্পটি পড়ে আনন্দ পায় আর এর পাশাপাশি সে অন্যান্য গল্প পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়।

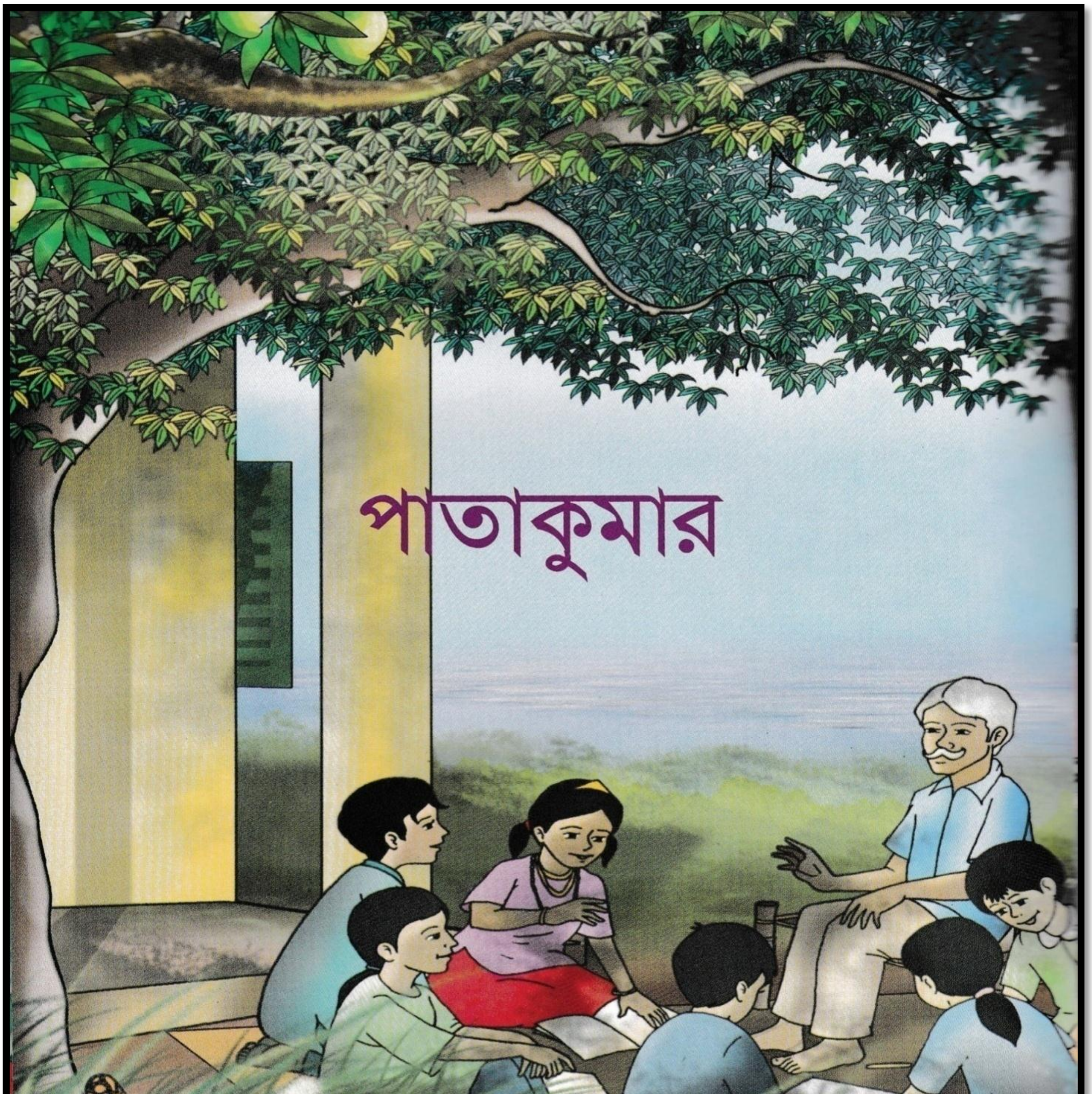
পাতাকুমার

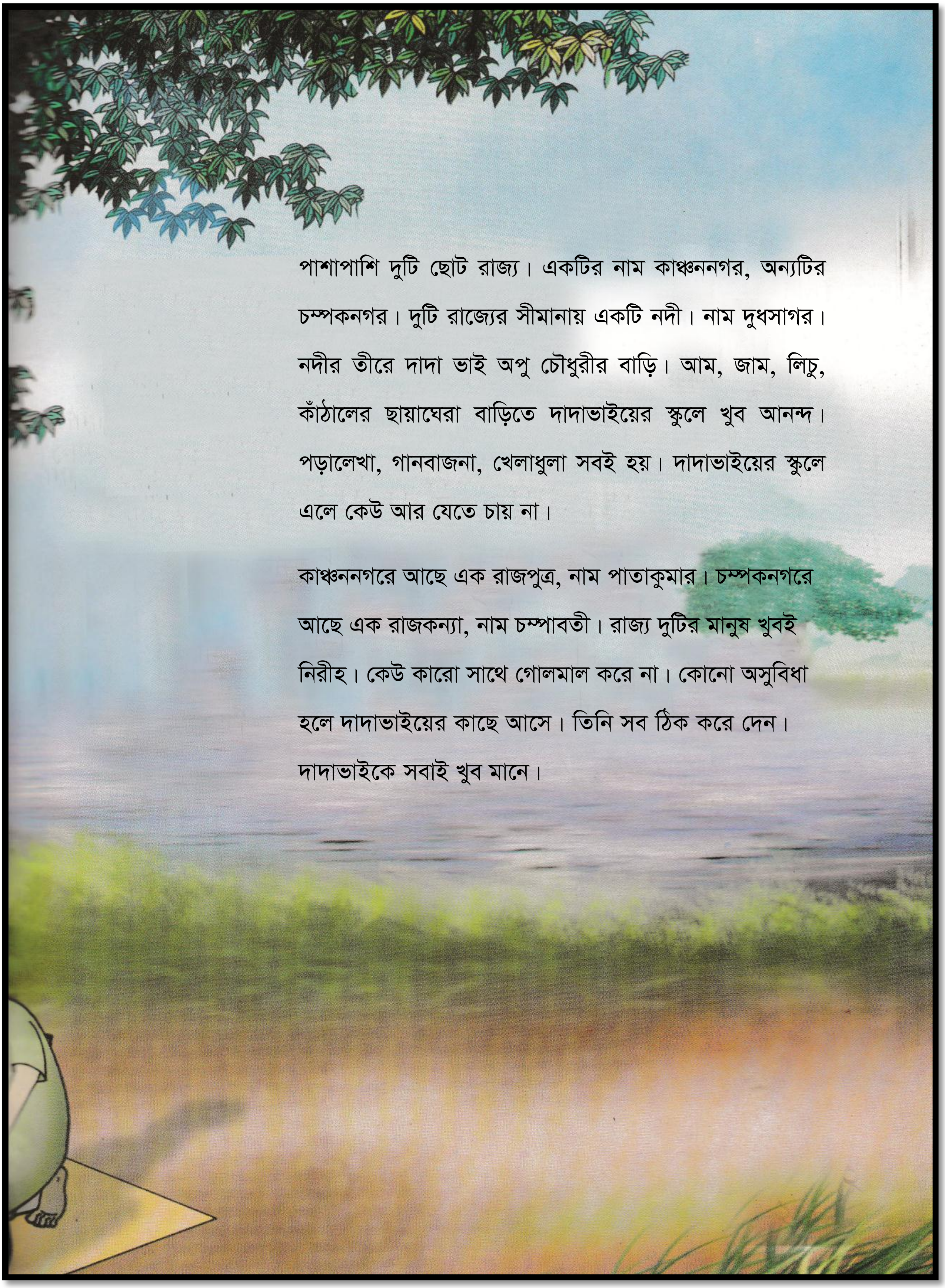

পাশাপাশি দুটি ছোট রাজ্য। একটির নাম কাঞ্চননগর, অন্যটির চম্পকনগর। দুটি রাজ্যের সীমানায় একটি নদী। নাম দুধসাগর। নদীর তীরে দাদা ভাই অপু চৌধুরীর বাড়ি। আম, জাম, লিচু, কাঁঠালের ছায়াঘেরা বাড়িতে দাদাভাইয়ের স্কুলে খুব আনন্দ। পড়ালেখা, গানবাজনা, খেলাধুলা সবই হয়। দাদাভাইয়ের স্কুলে এলে কেউ আর যেতে চায় না।

কাঞ্চননগরে আছে এক রাজপুত্র, নাম পাতাকুমার। চম্পকনগরে আছে এক রাজকন্যা, নাম চম্পাবতী। রাজ্য দুটির মানুষ খুবই নিরীহ। কেউ কারো সাথে গোলমাল করে না। কোনো অসুবিধা হলে দাদাভাইয়ের কাছে আসে। তিনি সব ঠিক করে দেন। দাদাভাইকে সবাই খুব মানে।

হঠাৎ কী নিয়ে যেন দু রাজার মধ্যে গোলমাল দেখা দিল। কেউ কারো মুখ দেখে না। একজন আর একজনের নাম শুনতে পারে না। একজন একটা কাজ করল, তো অপরজন পাল্টা আরেকটা করে। কাঞ্চননগরের রাজা হয়তো দাওয়াত দিয়ে দুই শ লোক খাওয়ালো। অমনি চম্পকনগরের রাজা চার শত লোক খাইয়ে দেয়। রাজায় রাজায় গোলমাল থাকলেও দু রানির মধ্যে খুব মিল। সব দেখেশুনে দাদাভাই ভাবলেন, এরকম করলে তো দুটি রাজ্যেরই ক্ষতি হবে। কাঞ্চননগরের এক মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, ‘বাপু হে, তোমরা গোলমাল থামাও।

মন্ত্রী বলে, 'না, দাদাভাই। চম্পকনগরের রাজা আমাদের অপমান করেছে।' কী অপমান করেছে, জিজ্ঞেস করলে আর বলতে পারে না। দাদাভাই বুদ্ধিমান। বললেন 'আচ্ছা, কাঞ্চননগরের দুটি স্কুল ভেঙে গেছে। ও দুটিকে দালান করে দাও দেখি।

মন্ত্রী রাজাকে বললে রাজা স্কুল দুটি দালান করে দিলেন।

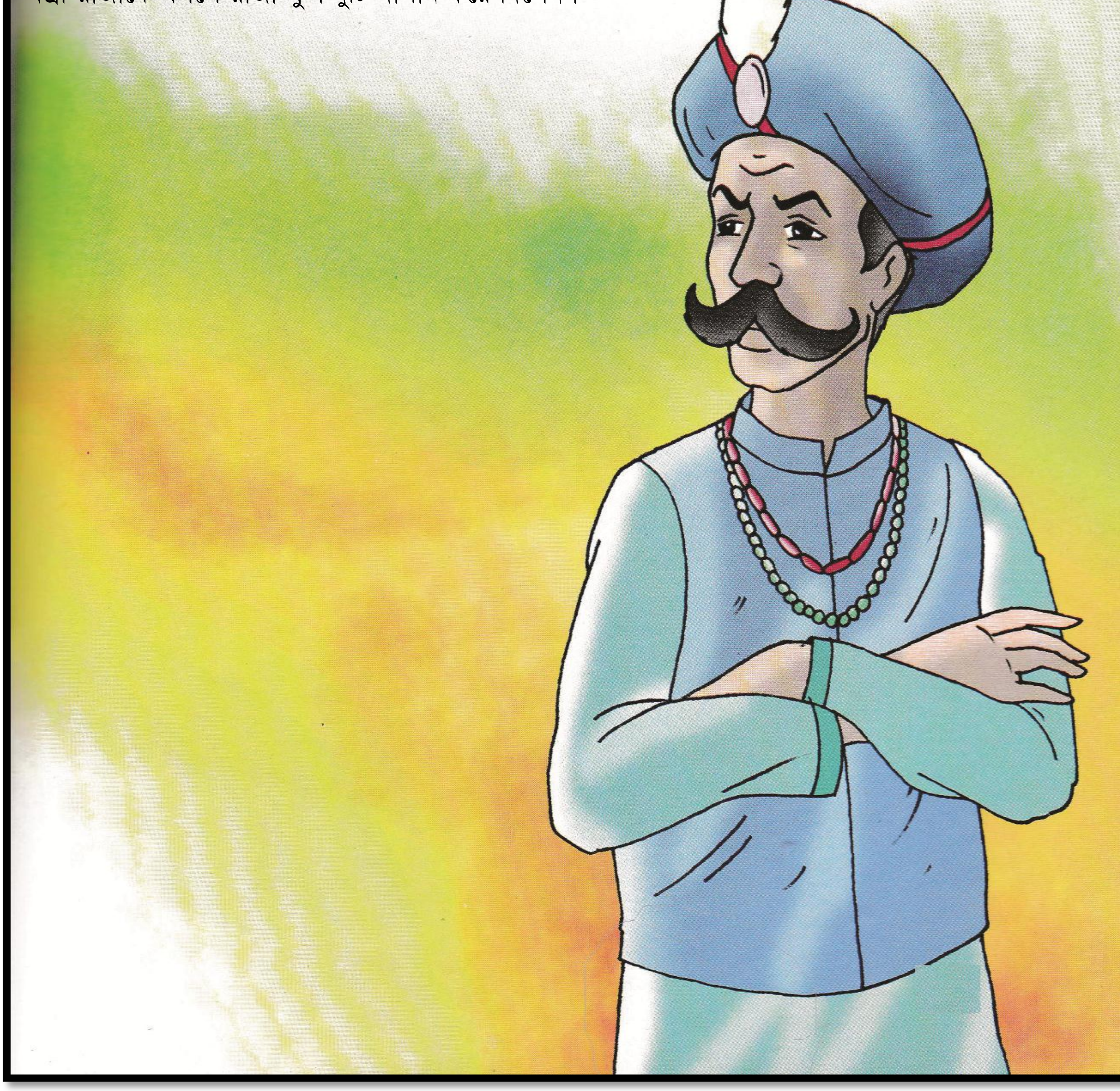

খবর গেল চম্পকনগরে। রাজা শুনে বললেন, 'কী? ওরা দুটো স্কুল পাকা করছে? আমি চারটা নতুন স্কুল বানাবো। তাছাড়া, বেশি বেতন দিয়ে ভালো শিক্ষকও রাখব।' দাদাভাই শুনে খুশি হলেন। দেখলেন প্রতিযোগিতা ভালোর দিকেই যাচ্ছে।

এদিকে পাতাকুমার আর চম্পাবতী দাদাভাইয়ের স্কুলে পড়া শুরু করে। ওরা দুজনেই পড়ালেখায় ভালো। দাদাভাই ওদের খুব ভালোবাসেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে বছর যায়। পাতাকুমার আর চম্পাবতী বড় হতে থাকে। দুই রানী ভাবেন, চম্পাবতীর সাথে পাতাকুমারের বিয়ে হলে মন্দ হয় না। কিন্তু বেঁকে বসলেন চম্পকনগরের রাজা। কোনমতেই তিনি চম্পাবতীকে পাতাকুমারের সাথে বিয়ে দেবেন না।

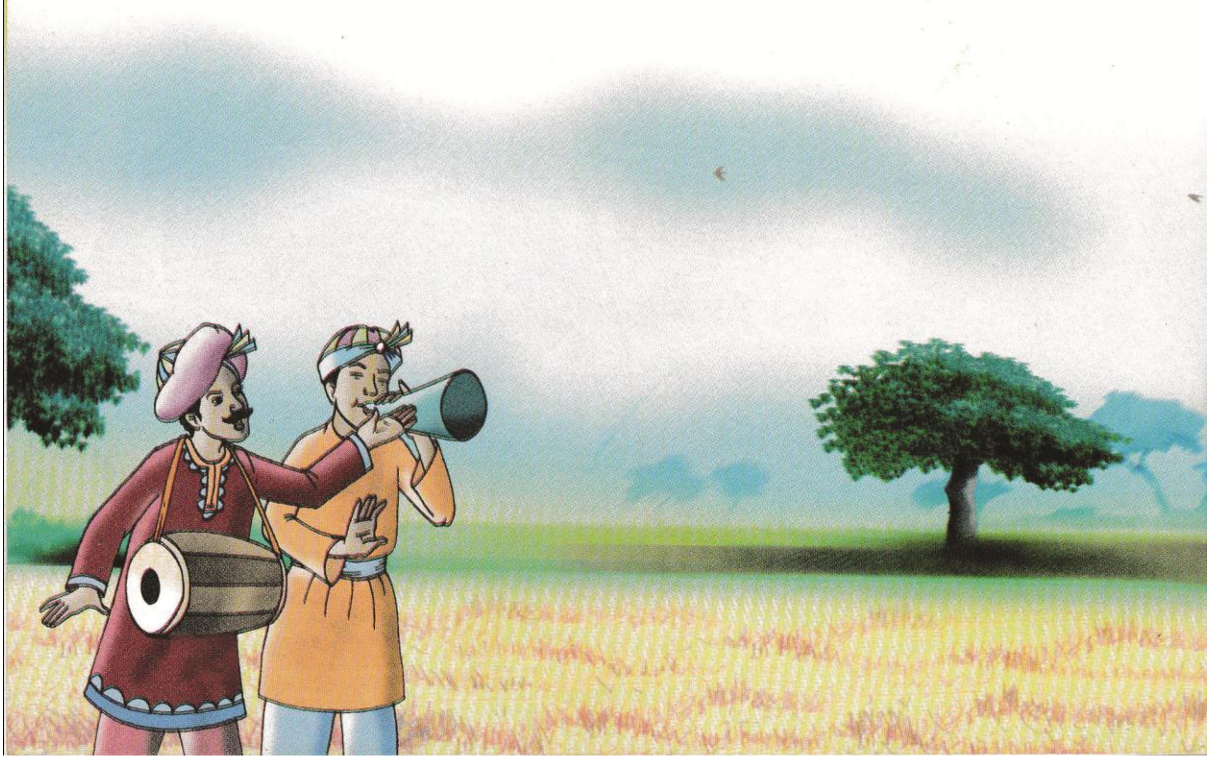

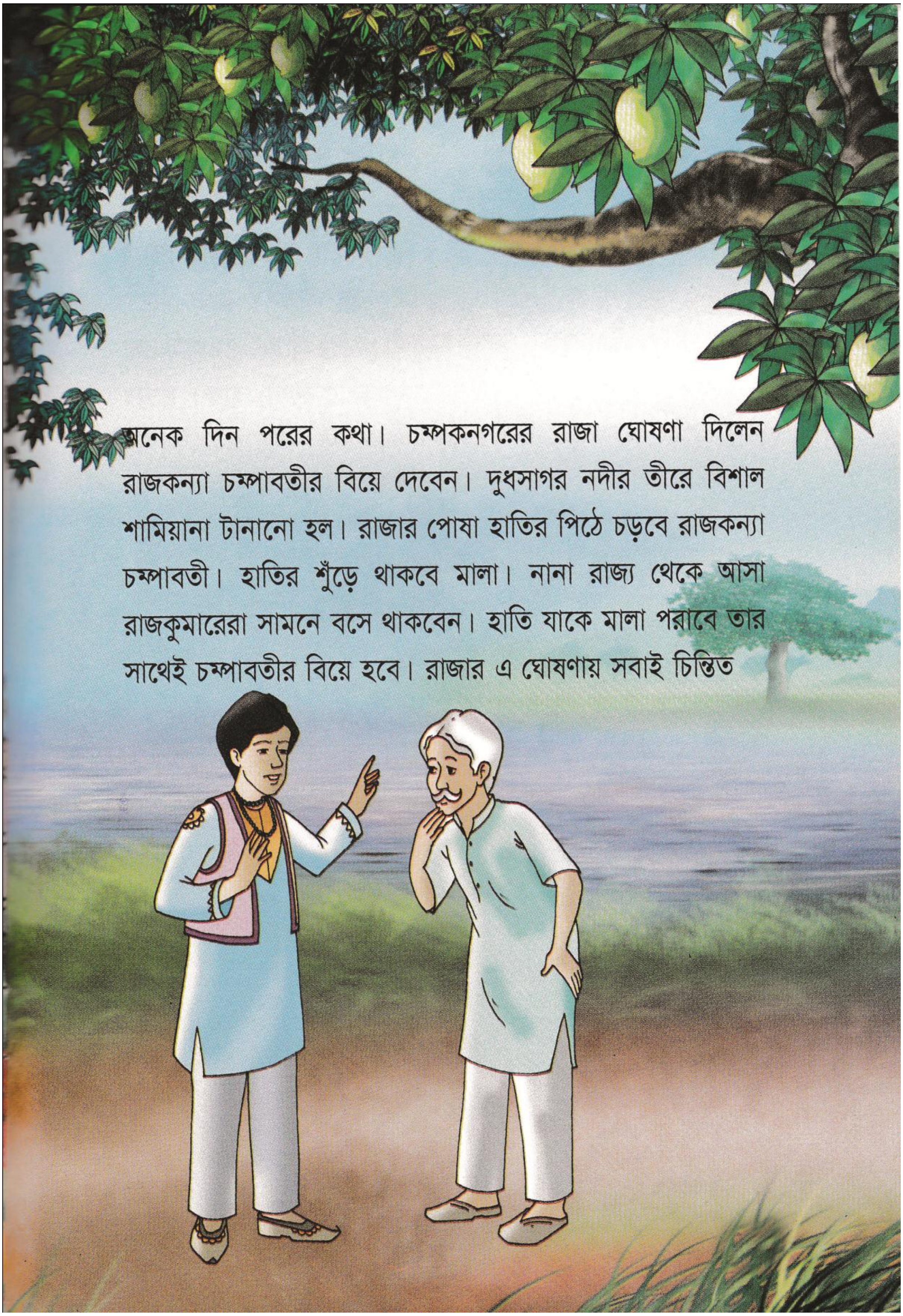

অনেক দিন পরের কথা। চম্পকনগরের রাজা ঘোষণা দিলেন রাজকন্যা চম্পাবতীর বিয়ে দেবেন। দুধসাগর নদীর তীরে বিশাল শামিয়ানা টানানো হল। রাজার পোষা হাতির পিঠে চড়বে রাজকন্যা চম্পাবতী। হাতির শুঁড়ে থাকবে মালা। নানা রাজ্য থেকে আসা রাজকুমারেরা সামনে বসে থাকবেন। হাতি যাকে মালা পরাবে তার সাথেই চম্পাবতীর বিয়ে হবে। রাজার এ ঘোষণায় সবাই চিন্তিত

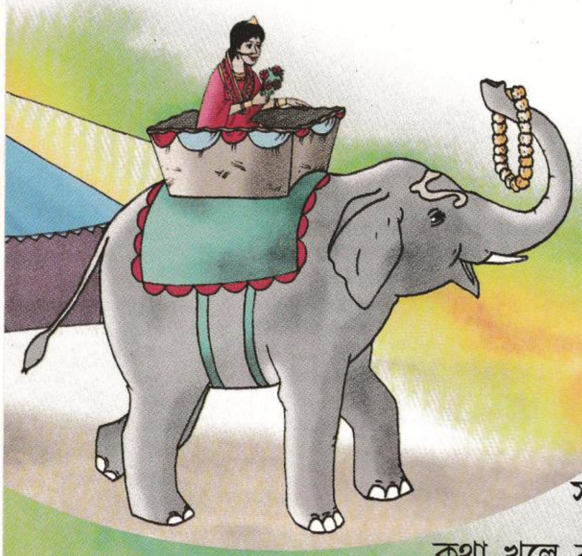

হলেন। হাতি কার না কার গলায় মালা পরায়। দাদাভাইয়ের কাছে এলেন কাঞ্চননগরের রানী। তাঁর ইচ্ছে পাতাকুমারের সাথে চম্পাবতীর বিয়ে হোক। মনের কথা খুলে বললেন দাদাভাই। দাদাভাই কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন, পাতাকুমার যেন তার সাথে দেখা করে।

অনুষ্ঠানের দিন নানা রাজ্যের কুমারেরা এসেছেন। কেউ বেলকুমার, কেউ ডালিমকুমার। আবার কেউ জ্যোতিকুমার, দ্যুতিকুমার, দুধকুমার, ঘিকুমার। পরনে বাহারি সাজ। পাতাকুমারের সাজ অন্যরকম। দাদাভাইয়ের বুদ্ধিমতে সে গলায় কলাপাতার মালা পরেছে। তা দেখে সবাই হাসাহাসি করছে।

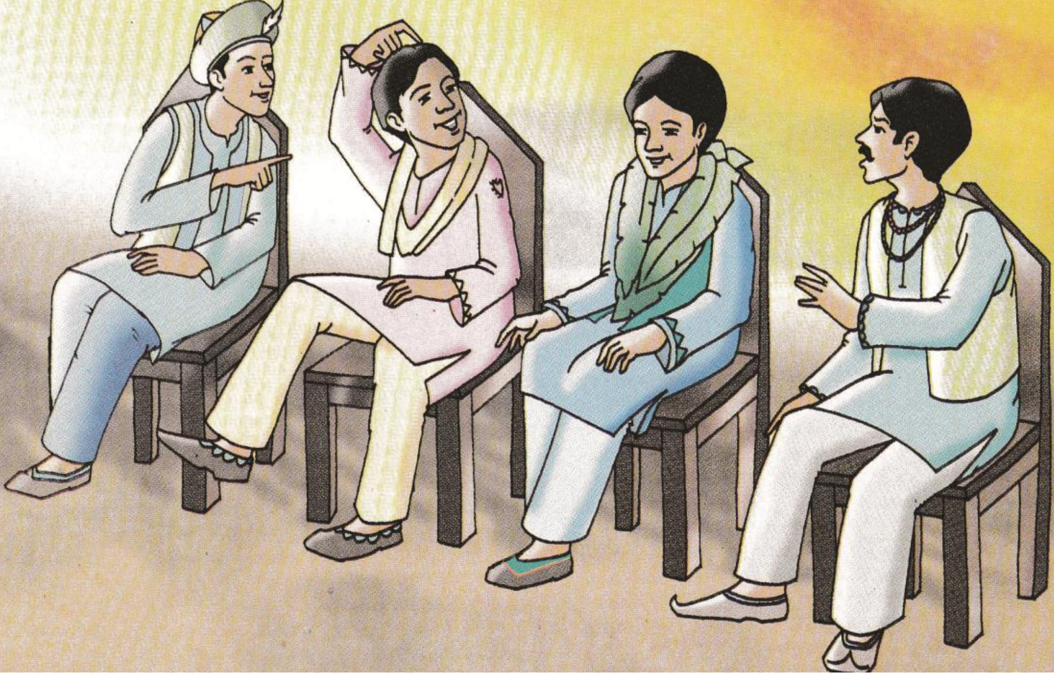

হাতিকে সাজানো হয়েছে। শুঁড়ে ফুলের মালা। পিঠে রাজকন্যা চম্পাবতী। রাজপেয়াদা ঘণ্টা বাজালো। ঢংঢংঢং। হাতি সভায় ঢুকল। সবার বুক ধুকধুক করছে। কার না কার গলায় হাতি মালা দেয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে হাতি। সামনে বেলকুমার, দুধকুমার, জ্যোতিকুমার, দ্যুতিকুমার, ডালিমকুমার, ঘিকুমার। সবাইকে তো ফেলে গেল। কী হবে এখন? কে হবে চম্পাবতীর বর? সবাইকে অবাক করে দিয়ে মালা পড়ল পাতাকুমারের গলায়। সাথে সাথে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। হাতি পাতাকুমারের গলার কলাপাতার মালা ছিঁড়ে খেতে লাগল।

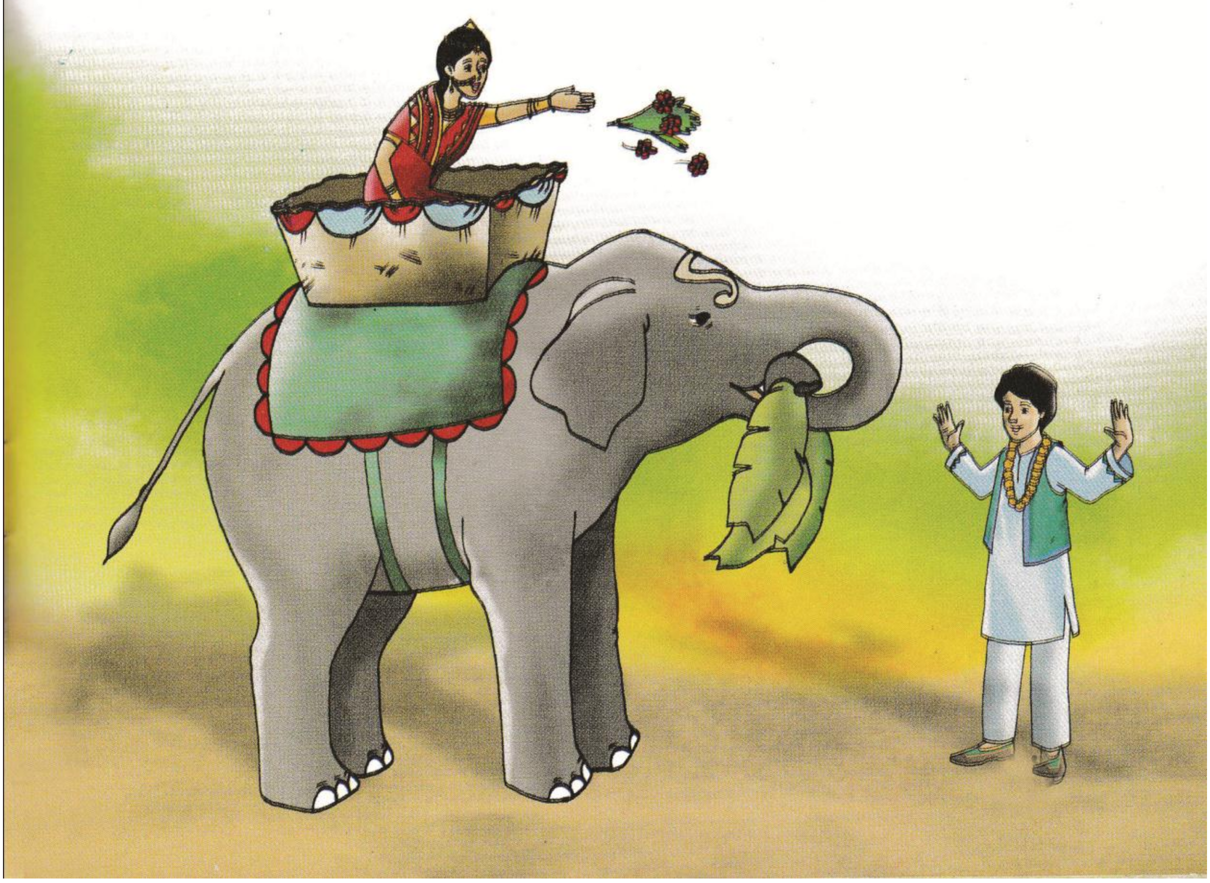

কাঞ্চননগরে খবর গেল। রাজা–প্রজা সবাই খুশি। দাদাভাই দু রাজ্যের রাজাদের ডাকলেন। বললেন, 'আর গোলমাল নয়। বিয়ের আয়োজন করুন। আজ থেকে আপনারা একে অপরের আত্মীয়।'

ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল পাতাকুমার আর চম্পাবতীর।

মূলভাব

কাঞ্চননগর ও চম্পকনগর রাজ্য দুটি ছিল খুবই সুন্দর, যেন ছবির মত। প্রজারা সবাই সুখে শান্তিতে ছিলেন। রাজ্যের মাঝখানে দুধসাগর নদীর তীরে ছায়াঘেরা একটি বাড়িতে থাকতেন একজন লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তি অপু চৌধুরী। রাজ্যের সবাই তাকে দাদাভাই বলেই ডাকতেন। শিশুরা তো দাদাভাইবলতেই পাগল। এজন্য দাদাভাইয়ের স্কুলে সবাই পড়তে যায়। রাজ্য দুটির সব মানুষই তার কথা শোনে এবং মানে। হঠাৎ করে দুটি রাজ্যের মধ্যে কী যেন হলো। কেউ কারো কথা শুনতে পারে না। একদিন দাদাভাই দুই রাজ্যের দুজন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমাদের কী সমস্যা? দেখি আমি সমাধান করতে পারি কিনা। সমস্যা যে দুটি রাজ্যের কী এ কথাটাও কেউ বলে না। শুধু একজন আরেক জনকে দোষ দেয়। দাদাভাই দেখলেন, এটাতো আর চলতে দেওয়া যায় না। তিনি কিছু কৌশল প্রয়োগ করলেন। দুই রাজ্যের বিবাদ মোটানোর জন্য। তার পরিকল্পনার কারণেই পাতাকুমার আর চম্পাবতীর বিয়ে হলো। দাদাভাই দুই রাজ্যের রাজাকে কাছে ডেকে বললেন, আর কোন বিবাদ নয়। আপনারা এখন পরস্পরের আত্মীয়। পাতাকুমার আর চম্পাবতী রাজ্যের রাজা প্রজা সবার মধ্যেই শান্তি ফিরে এল। সুখের চেয়ে শান্তি ভালো।

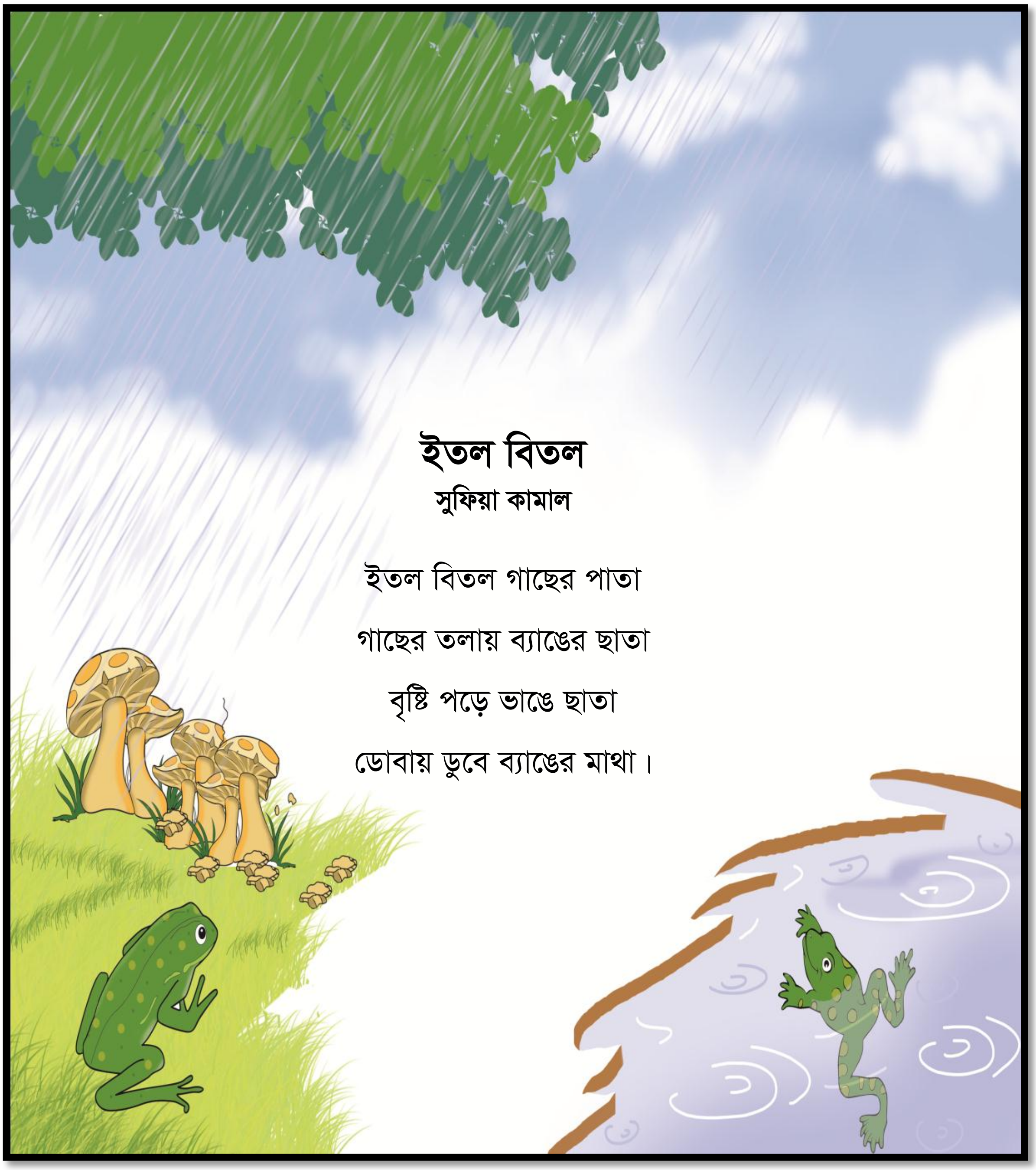

ইতল বিতল

সুফিয়া কামাল

ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা
বৃষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা
ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা।

মূলভাব

'অর্থের গভীরতা নয়, শিশুসুলভ সরলতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য' – ছড়া সম্পর্কিত এই উক্তিটির যথার্থতা মেলে এই ছড়াটির মাধ্যমে। সাধারণভাবে এখানে কল্পনার বাহনে চেপে শিশু তার মনের মতো করে এক ভিন্ন জগতে প্রবেশের চেষ্টা নেয়। ছড়াটির প্রদত্ত পঙক্তি থেকে দেখা যায়, একটি গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা। ব্যাঙ, ব্যাঙের ডাক, বর্ষাকাল, ছাতা ইত্যাদি যেমন শিশুর কাছে অনাবিল আনন্দের উৎস, তেমনি ইতল-বিতল নামক অচেনা গাছের তলা প্রভৃতি তার কাছে কৌতূহলোদ্দীপক।

এই ছড়াটির এসকল বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে রয়ে গেছে ভাষাচর্চার এক নন্দিত অধ্যায়। শিশুর ভাষাদক্ষতা চর্চার প্রাথমিক ধাপ হলো প্রাককথন। শিশু কিছু শুনলেও অনুরূপভাবে বলার দক্ষতা অর্জন করে না। কারণ উত্তমভাবে বলার জন্য প্রয়োজন বাক-প্রত্যঙ্গগুলোর নিয়ন্ত্রিত আচরণ। এই ক্ষেত্রে এ ছড়াটির বহুমাত্রিকতা যেমন ধ্বনি চর্চার (ইতল – ইতোল, বিতল – বিতোল ইত্যাদি) মাধ্যমে সাবলীলভাবে বলার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

কর্ম অনুশীলন

১. নিম্ন বর্ণিত শর্তের আলোকে উক্ত ছড়ার একটি সমমানের ছড়া রচনা করুন।

শর্তসমূহ :

১. ছড়ার লাইন – ৪,

২. প্রতি লাইনে শব্দ সংখ্যা – ৪,

৩. প্রতি শব্দে বর্ণ সংখ্যা – ২/৩ এর অধিক নয়,

৪. ২য় ও ৪র্থ লাইনের শেষে দাড়ি (।) যতি চিহ্নের ব্যবহার,

৫. যুক্তব্যঞ্জন শব্দ থাকবে না,

৬. শব্দের ধ্বনিগত মিল থাকবে ২য় ও ৪র্থ লাইনে।

যদু মাস্টার

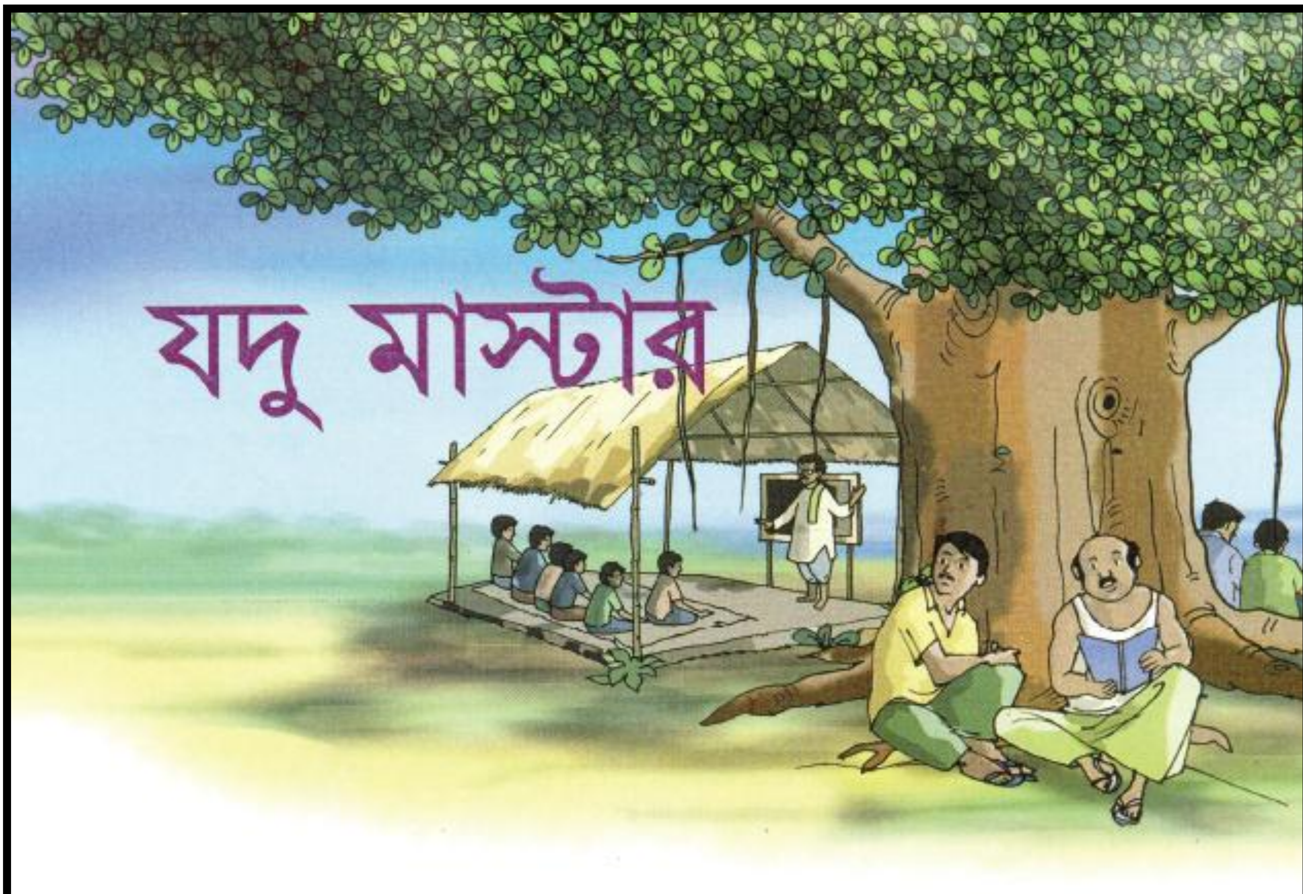

যখনকার কথা বলছি তখন দেশে এত স্কুল হয়নি। এখনকার মতো এত ছেলেমেয়েও স্কুলে পড়ত না। দু-চর গাঁও পরে স্কুল। তাও খাল পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, কখনও বা নদী পেরিয়ে যেতে হত। স্কুলও ছিল তেমনি। কোথাও ছনের চালা, তার বেড়া নেই। কোনোটা আবার গাছের নিচে, ঘর নেই। ভুঁইয়া বাড়ির খালের পাড়ে বড় বট গাছ। গরমের দিনে দুপুরবেলায় সবাই গাছের নিচে বসে। বটের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। যদু মাস্টার এখানেই ১০–১২ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়ায়। ওপরে খড়ের একটা চালা। বসারও তেমন ব্যবস্থা নাই। শুধু কয়েকটা ছেঁড়া চট ছাড়া। এটাকে সবাই বলে যদু মাস্টারের স্কুল।

ছাত্ররা বেতন দেয় না। ঠিকমতো আসেও না। তবুও মাস্টারের স্কুল খোলা চাই। মাঝে মাঝে যদু মাস্টারের বউ রেগে যায়। বলে, 'কী লাভ ছাত্র পড়িয়ে, জমিতে কাজ করলেও তো সংসারের উন্নতি হয়।' যদু হাসে। বলে, 'কাউকে কিছু শেখানোর যে কত আনন্দ তা তুমি বুঝবে না।'

দুপুরে ছাত্ররা পড়ে চলে যায়। যদু ভাবে, সামনে বর্ষা। খড়ের চালায় কুলাবে না, ভেঙে পড়বে। তখন কী হবে! এই ভাঙা ঘরে পড়তে আসবে কারা।

ফজল চাচা একদিন মাস্টারকে ডেকে বলেন, 'যদু, বসে বসে ভেবে লাভ নেই। এ গাঁয়ে তোমার স্কুলের চালা ঠিক করার জন্য টাকা দেয়ার সামর্থ্য কারো নেই।' যদু বলে, 'চাচা, শুধু কি চালা? ছাত্রদের তো বইও নেই। এত টাকা পাই কোথায়! বই না হলে পড়বে কী?' ফজল চাচা বলে, 'শোন, তিন গ্রাম দূরে পীরহাটির জঙ্গল পেরিয়ে মাধবপুরের জমিদার আমীর খাঁর বাড়ি। বড় ভালো মানুষ। গেলে কিছু পেতে পার।'

পরদিন সকাল সকাল চারটে ভাত খেয়ে একটা লাঠির মাথায় পোটলা বেঁধে রওয়ানা দেয় যদু। পথ তো কম নয়। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সন্ধ্যার আগেই পার হতে হবে পীরহাটির জঙ্গল। বলা তো যায় না। এদিকে নাকি খগা ডাকাতের আস্তানা। ওর হাতে পড়লে তো আর রক্ষে নেই। জীবনও যেতে পারে।

পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে। বাতাস বইতে লাগল। পা চালালো যদু। শুরু হল ঝড়। এই বনের মধ্যে কোথায় আশ্রয় পাবে? চারদিকে শুকনো ডাল বাতাসে মটমট করে ভাঙছে। দৌড়াতে দৌড়াতে দেখে সামনে এক ভাঙা বাড়ি। যদু ছুটতে ছুটতে ভাঙা দালানে আশ্রয় নেয়। ঢুকে পড়ে তার মধ্যে। কিন্তু ঝড় তো থামে না। সাথে বৃষ্টি। ভাঙা বাড়ির ঘরের এক কোণে বসে পড়ল চুপচাপ। দরজা–জানালা সব ভাঙা। বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে।

বোধ হয় ঘুম এসে গিয়েছিল। লাঠির ঘায়ে জেগে দেখে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে একজন। ভয় পেল যদু মাস্টার। বুঝল, আর রক্ষে নেই। ডাকাতের হাতে পড়েছে।

‘চল্ ওস্তাদের কাছে। সাহস তো কম না। চামচিকের মতো চেহারা। এসেছিস খগা ডাকাতের আস্তানায়,’ বলল লোকটা।

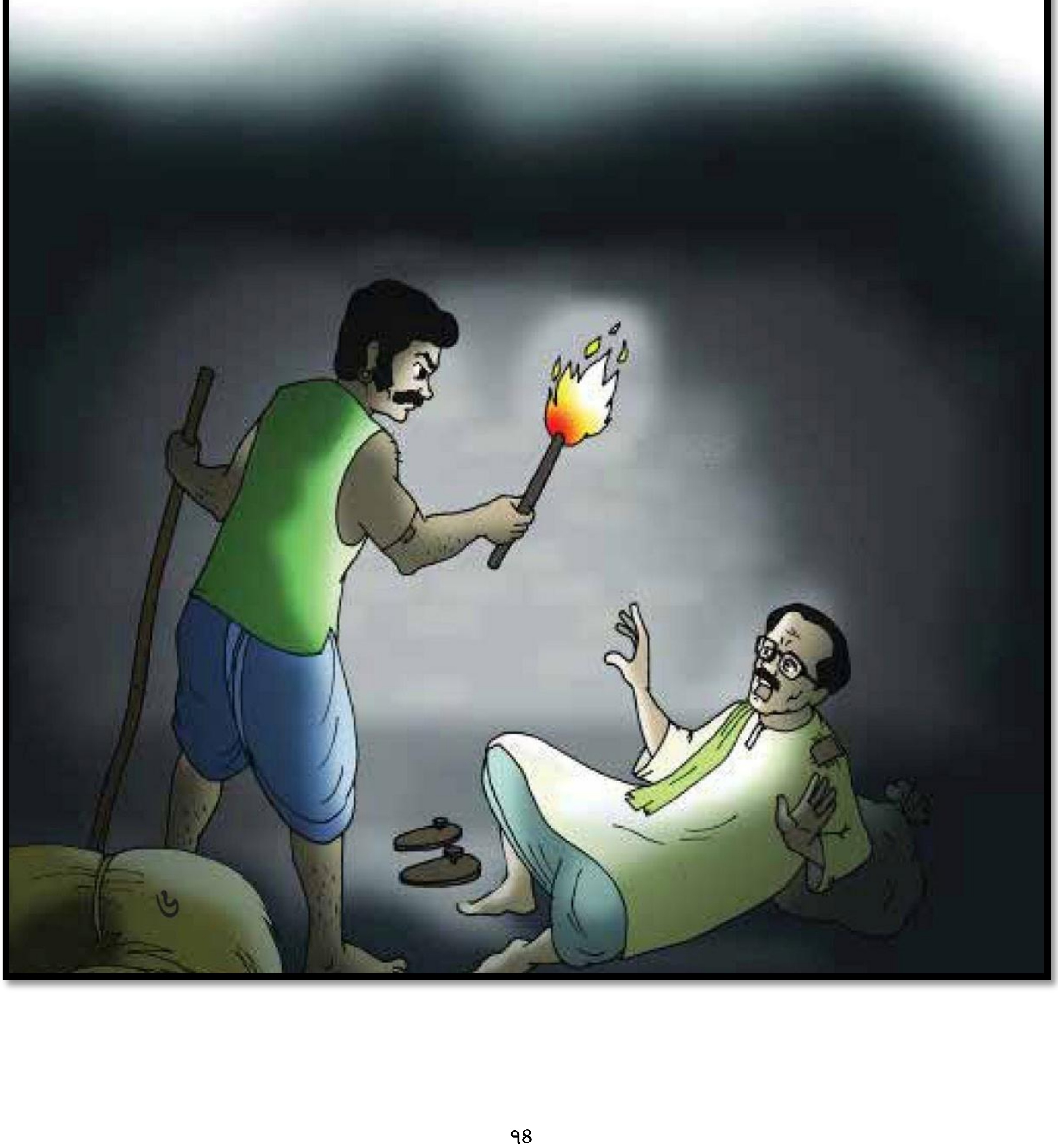

যদু লাঠি আর পোটলাটা কাঁধে নিয়ে চলল সাথে। বাড়িটা ভাঙা হলেও অনেক বড়। অনেকগুলো ঘর। চার–পাঁচটা ঘর পার হয়ে এল ভেতরের এক ঘরে। দেখে ঘরের মাঝখানে খড়ের গদি পাতা। তার ওপর বসে বিশাল চেহারার এক লোক। ওর পাশে আরো তিন–চার জন। যদুর বুঝতে বাকি রইল না এ কে।

'খগার আস্তানায় ঢোকার সাহস কোথায় পেলি?' জিজ্ঞেস করল খগা ডাকাত। যদু কাঁপছে। একজন বলল, 'সর্দার, ওর পোটলা দেখি। এ বেটা নিশ্চয়ই পুলিশের চর।' একজন পোটলাটা খুলল। দেখে বলল, 'সর্দার এতে আছে একটা লুঙ্গি, গামছা আর চারটে চিড়ে–গুড়।'

খগা বলল, 'এই বল, তুই কে? কী করিস? কোথায় যাচ্ছিস? এখানে এলি কেন?' যদু কাঁপতে কাঁপতে সব কথা বলল। খগা ডাকাতের বোধ হয় দয়া হল। একজনকে ডেকে বলল, 'এই বুধো, একে খেতে দে।'

'আগে পেট ভরে খাও। অন্য উপায় দেখতে হবে না,' গম্ভীর গলায় খগা বলল। তারপর দু জনকে দেখিয়ে বলল, 'কাল সকালে কাঠু আর পেঁচা যাবে তোমার সাথে। যদি তোমার স্কুল, ছাত্রছাত্রী পড়ানো সব কথা ঠিক থাকে, তবে তোমাকে ওরা সাহায্য করবে। আর যদি মিথ্যা হয়, ওই ভুইয়া বাড়ির খালের পানিতে তোমায় ডুবিয়ে দেবে।' কথাগুলো বলে খগা ডাকাত কাঠু আর পেঁচার দিকে ফিরল। বলল, 'কাঠু, পেঁচা, তোরা বড় মোষের গাড়িতে মাস্টারের স্কুল ঘরের জন্য খড় নিবি। আর এই নে কিছু টাকা। মাস্টার, এখন ঘুমাতে যাও। এখন আমি চলি।' এই বলে খগা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভাঙা বাড়ির মধ্যে কাঠু আর পেঁচা ডাকাতের মাঝখানে খড়ের বিছানায় শুয়ে যদু চিন্তা করতে লাগল। একি হয়? এটা কি সত্যি? খগা ডাকাতের টাকায় হবে তার স্কুল? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল যদু।

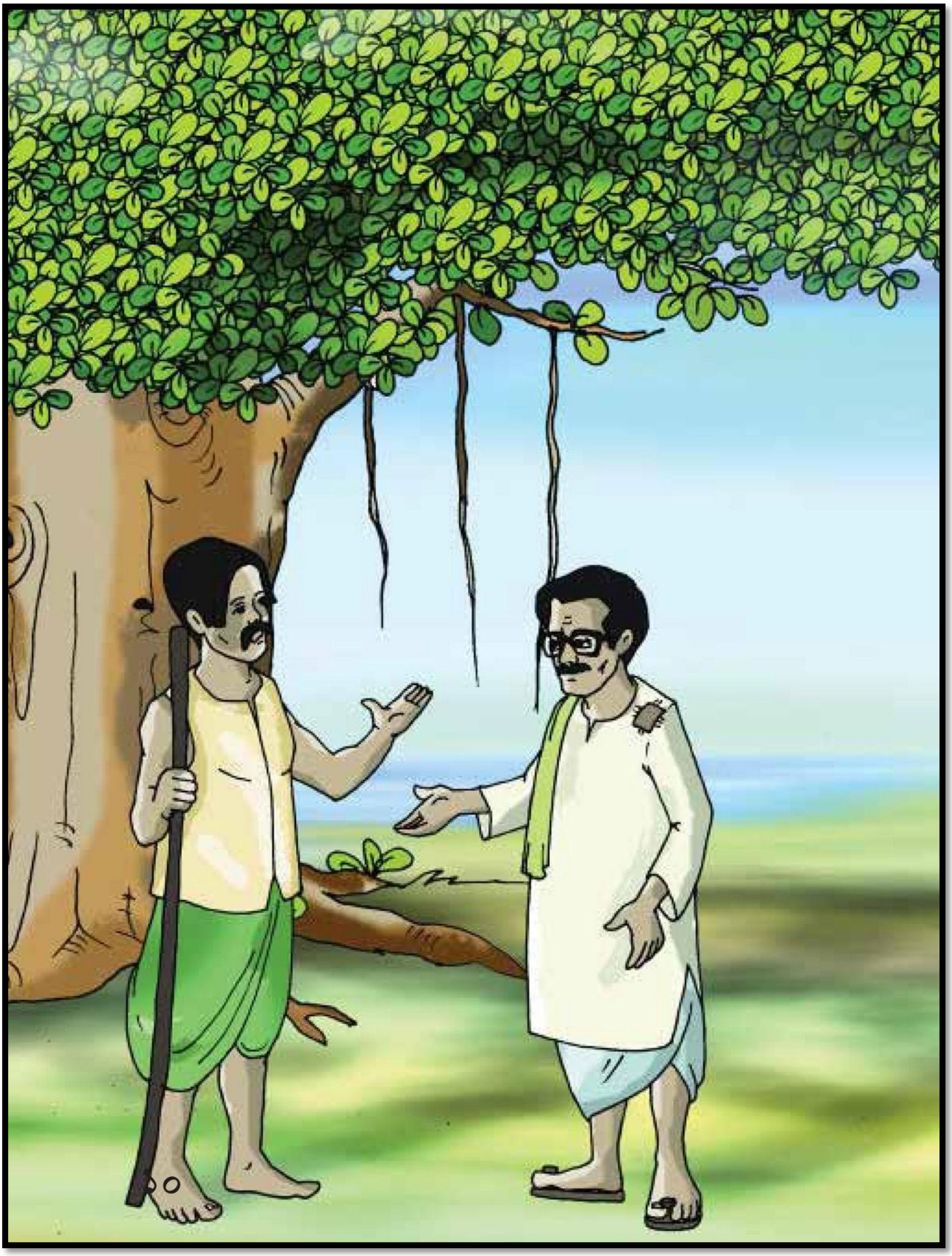

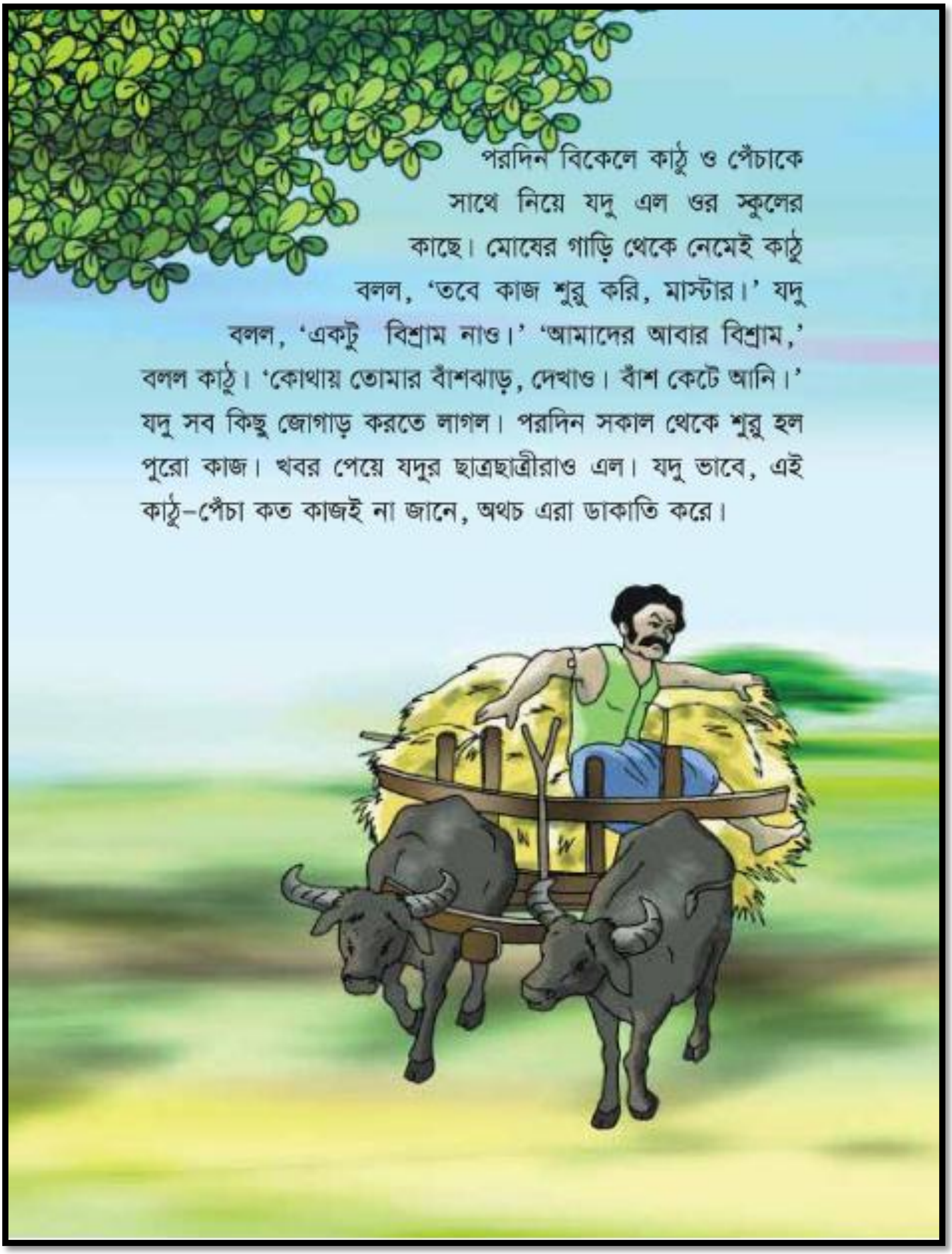

পরদিন বিকেলে কাঠু ও পৈচাকে সাথে নিয়ে যদু এল ওর স্কুলের কাছে। মোষের গাড়ি থেকে নেমেই কাঠু বলল, 'তবে কাজ শুরু করি, মাস্টার।' যদু বলল, 'একটু বিশ্রাম নাও।' 'আমাদের আবার বিশ্রাম,' বলল কাঠু। 'কোথায় তোমার বাঁশঝাড়, দেখাও। বাঁশ কেটে আনি।' যদু সব কিছু জোগাড় করতে লাগল। পরদিন সকাল থেকে শুরু হল পুরো কাজ। খবর পেয়ে যদুর ছাত্রছাত্রীরাও এল। যদু ভাবে, এই কাঠু-পৈচা কত কাজই না জানে, অথচ এরা ডাকাতি করে।

ফজল চাচা এসে স্কুলের কাজ দেখে একগাল হেসে বলে, 'বলিনি মাস্টার, আমীর খাঁ কত ভালো লোক? তোমার স্কুল ঘর করে দেবে!' যদু চুপ করে থাকে।

তিন দিন পর স্কুল ঘরে খড়ের ছাউনি হল। কাঠু বাজার থেকে চট কিনে ছেলেমেয়েদের বসার ব্যবস্থা করল। নতুন ঘর আর বসার জায়গা হওয়ায় আরো নতুন ছেলেমেয়ে স্কুলে আসতে লাগল। যদুর মনে এখন আনন্দ। বৃষ্টি–বাদলায় ওর স্কুল আর নষ্ট হবে না।

কাজ শেষ। কাঠু ও পেঁচা চলে যাবে। যদু বলল, 'এস, মাঝে মাঝে তোমার ওস্তাদকে এদিকে আসতে বোলো।' কাঠু পেঁচা ফিরে চলল ওদের বুধারগাঁতী গ্রামে। যেতে যেতে পেঁচা বলল, 'কাঠু, দেখ, যদু মাস্টার কত ভালো কাজ করছে। কত ছেলেমেয়ে ওর কাছে পড়ালেখা শেখে। আমাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। চলো না ওদের স্কুলে ভর্তি করি। পড়ালেখা শেখাই।' কাঠু বলল, 'হ্যাঁ, পেঁচা। চল তাই করি। আর আমরাও ডাকাতি ছেড়ে দিই। জমি যা আছে কাজ করলে অভাব হবে না। ওস্তাদকেও বলি কথাটা।'

দিনে দিনে যদুর স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এখন অনেক ছেলেমেয়ে। একদিন বিকেলবেলা। স্কুলের বারান্দায় বসে ভাবছে যদু, কতজনের কাছে টাকা চাইলাম, কেউ দিল না। দিল এক ডাকাত। ইস, ওরা যদি ভালো হত। হঠাৎ পেঁচা এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'মাস্টার, আমরা ভালো হয়ে গেছি। আর ডাকাতি করি না। তোমাকে দেখে বুঝতে পেরেছি ডাকাতি করা ভালো নয়। এখন চাষাবাদ করি। সর্দারও চাষাবাদ করে। সর্দার বলেছে, তার ছেলেমেয়ে বড় হলে তোমার এখানে পাঠাবে। ওরা পড়ালেখা শিখবে। মাস্টার, কাউকে বলনি তো আমরা ডাকাত!' যদু হেসে বলল, 'না, পেঁচা, কাউকে বলিনি। কিন্তু এখন তো তোমরা ভাল মানুষ।'

যদু মাস্টারের স্কুল এখন জমজমাট। কোনো বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে জন্ম নিলে ফজল চাচা সেখানে হাজির হয়। একগাল হেসে বলে, 'বড় হলে যদু মাস্টারের স্কুলে পাঠাবে কিন্তু।'

মূলভাব

যদু মাস্টার গ্রামের একজন সহজ-সরল নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। কোনো কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা তাঁর নেই। শিক্ষার্থীদের মঙ্গল কামনাই তাঁর একমাত্র ভাবনা ও কাজ। এ জন্যই স্কুলঘরের দৈন্যদশা তাঁকে ব্যথিত করে। তিনি এর মেরামতের কথা ভাবেন। এ ভাবনাই তাঁর বিপদ ডেকে আনে। সাহায্য চাইতে গিয়ে পথিমধ্যে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন। কিন্তু ডাকাতের হাতে আটক হয়েও তিনি বিচলিত হননি। চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তাই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি সত্যবাদী। তাঁর সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে ডাকাতরাই শেষ পর্যন্ত স্কুলঘর মেরামত করে দেয়। যদু মাস্টারের সংস্পর্শে এসে ডাকাতরা তাঁদের পেশা পরিবর্তন করে সমাজে সৎভাবে বসবাস করতে থাকে। সততার এই দৃষ্টান্ত শিশুর মনকে দোলা দেবে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে।

অধ্যায় ৪

ছড়া

সাহিত্যের এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শাখা ছড়া। বিশেষ করে শিশু সাহিত্যে ছড়ার একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে। এর আদি উৎস লৌকিক। ছড়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে জড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'ছড়া' বাংলার লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। এর প্রচার সর্বাঞ্চলীয়। বাংলার এমন একটি ঘর নেই, যেখানে দু-দশটি ছড়ার প্রচলন নেই।

ছড়া বলতেই শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ পদ্যরচনার কথা মানসপটে জেগে ওঠে। কবিতা বা পদ্যের সঙ্গে এই শ্রেণির রচনার পার্থক্য অনেক। অর্থের গভীরতা নয়, শিশুসুলভ সরলতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'ছট্' ধাতু থেকে ছড়া শব্দের উৎপত্তি বলে গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয় ছড়ার ভাব বা চিত্ররাশি ছড়ানো-ছিটানো থাকে। যা থেকে বোধ করি এরূপ নামকরণ। তবে এর নানাভাব বা চিত্র লক্ষ করা গেলেও তা যে এলোমেলো ছড়ানো ছিটানো তা নয়। বরং কলার ছড়ার মতো বিচিত্র ভাব বা ছবির এক অন্তরঙ্গ বন্ধনে এটি বাঁধা পড়ে। প্রথাগতভাবে শিশুদের কাছে যে পদ্য বলা বা গান করা হয় তাই ছড়া। অর্থাৎ ছড়া হচ্ছে 'হাল্কা চালের পদ্য' (অন্নদাশঙ্কর রায়) তবে সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে ক্ষুদ্র অবয়বে যে বাঙময় রূপ লাভ করে তাই ছড়া। (ওয়াকিল আহমেদ)

বৈশিষ্ট্য

ছড়ার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ছড়া মূলত আবেগ অনুভূতিজাত যেখানে উদ্ভট ও অযৌক্তিক বিষয়ও নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে শিশু মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেমন-

টুমুস টুমুস বাদ্যি বাজে
লোকে বলে কী
শামুক রাজা বিয়ে করে
ঝিনুক রাজার ঝি। (ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ছড়া শুধু শিশুদের জন্য নয়। বিভিন্ন বিষয়কে সবার কাছে সহজ, বোধগম্য ও রসাত্মকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও ছড়া ব্যবহৃত হয়। কোনও বিষয়ের গভীরতা বোঝাতে ব্যঙ্গাত্মকভাবেও ছড়া ব্যবহার করা হয়। যেমন, দেশবিভাগ নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত ছড়া

তেলের শিশি ভাঙল বলে,
খুকুর 'পড়ে রাগ করো?
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা,
ভারত ভেঙে ভাগ করো?
তার বেলা?

ছড়া চর্চায় সব ধরনের নরনারী অংশগ্রহণ করে। দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ছড়া। খনার বচন বাংলা সাহিত্যে তেমনি এক ছড়া। কৃষি কাজে, আবহাওয়া ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে খনার বচন আমাদের মুখে থাকে। যেমন- কৃষি সম্পর্কে 'কলা রয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।' আবহাওয়া সম্পর্কে 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ।'
ছড়ার বৈচিত্র্য বহুমাত্রিক। যেমন- ছেলে ভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া থেকে লঘু গুরু সব ধরনের বিষয় এবং হাস্য-ব্যঙ্গ-করুণ-শান্ত নানা ধরনের রস নিয়ে ছড়া হয়। যেমন-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ব্যঙ্গাত্মক কবিতা'নন্দলাল' এ জাতীয় কবিতার উদাহরণ।

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ
স্বদেশের তরে, যে করেই হোক, রাখবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল?
নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল 'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!'

ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে। যে কোন ভাষার প্রবহমান প্রাণশক্তিকে ধারণ করতে পারে কেবল সিলেবিক ছন্দের ছড়াগুলো। কেননা সাধারণের প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত এক ছন্দে রচিত হয় ছড়া। ছন্দের এই স্বতঃস্ফূর্ততাই ছড়াকে করেছে যুগোত্তীর্ণ। তাছাড়া গভীর কোন ভাবার্থ নয়, ছড়ার বিষয় হচ্ছে ছন্দের আনন্দ। বাংলা ভাষায় ছড়া স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। উচ্চারণের দ্রুততা ও সবলতা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্রুততা, প্রবল শ্বাসাঘাতের জন্যই স্বরবৃত্ত ছন্দ অধিকতর প্রাণবন্ত এবং কথাভাষার উপযোগী হয়ে উঠেছে। স্বরবৃত্ত ছন্দ ৪/৪ ছন্দে রচিত।

সাত লাঠিতে | ফড়িং মারেন | এমনি পালো | য়ান

দাঁত দিয়ে সে | ছিঁড়লে সেদিন | মস্ত আলো | য়ান

মাত্রাবিন্যাস : ৪+৪+৪+২ = ১৪

রাত পোহাল | ফরসা হল | ফুটল কত | ফুল

উড়িয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুটল অলি | কুল

মাত্রাবিন্যাস : ৪+৪+৪+১ = ১৩

স্বরবৃত্ত ছন্দে বদ্ধাক্ষর ও মুক্তাক্ষর দুই ক্ষেত্রেই এক মাত্রা হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত ছড়াগুলো ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং ২ ও ৩ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে গঠিত (আবৃত্তির সময় এক নিশ্বাসে যতটুকু চরণ একবারে উচ্চারিত হয় তাকে পর্ব বলে)।

ছড়া আবৃত্তি করা সুখকর। উচ্চারণ, ঝোঁক, সময়, যতির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো ছড়ার আবৃত্তিকে সুখকর করে তোলে। ছড়াটি তখন শ্রুতি মধুর হয়ে ওঠে।

ছড়ার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল ও প্রত্যক্ষ; কৃচিৎ হেঁয়ালি ভাষাও ব্যবহৃত হয়। ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনি স্পন্দিত বলে স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়। অনুকার শব্দগুলো মানুষের মনে গেঁথে থাকে দীর্ঘ সময়। যেমন-

ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা,
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পটকা!
শাঁই শাঁই পন পন ভয়ে কান বন্ধ

ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপধাপড় ওকি শুনি ভাই রে!
দেখছ না হিম পরে যেওনাকো বাইরে।

ছড়া চিত্তবিনোদনের নির্মল মাধ্যম। নৈতিকতার বিচারে তা মূলত শ্লীল ও রুচিসম্পন্ন। ছড়ার ভাব শোভন, রুচিসম্পন্ন ও সর্বজনগ্রাহ্য।

ছড়ার গুরুত্ব

ছড়া শুনলে প্রথমেই মনে হয় ছড়ার প্রতিটি ধ্বনি ও শব্দ চয়ন করা হয়েছে স্নেহ, আদর, মমতা ও প্রীতির স্পর্শ দিয়ে। শঙ্খের ভিতরে যেমন সমুদ্রের কলো ধ্বনি শোনা যায়, ছড়ার মধ্যে তেমনি হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় আর উত্তাপ অনুভব করা যায়। যেমন-

চাঁদ কোথায় পাব যাদুমণি
মাটির চাঁদ না, গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ না, পেড়ে দেব,
তোর মত চাঁদ কোথায় পাব।
তুই যে চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার যাদুমণি।

(সংগ্রহ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই ছড়াটিতে কবি শিশু ও চাঁদ কে মুখ্য শব্দ রেখেছেন। চাঁদের প্রতি শিশুমন সহজে আকৃষ্ট হয়। মা শিশুমনের ভালোলাগার সুযোগ নিয়েছেন। চাঁদ শিশুর প্রিয়, তাকে ডাকা হচ্ছে চাঁদ বলে। এতে করে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ প্রকাশিত হয়েছে। আদরার্থে 'যাদুমণি' সম্বোধনও করেছেন শিশুকে।

একটি কথাকে বারেবারে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় ছড়ার গানে। আর তা বারবার শুনতে শুনতে কখন যেন আত্মস্থ করে ফেলে শিশুটি। শিখে যায় তার প্রয়োগও। এভাবে ছড়ার মাধ্যমে এক একটি কথা ও শব্দ মনে রেখে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে শিশুরা। ফলে দিনে দিনে শক্তিশালী হয় তাদের মনে রাখার ক্ষমতা।

ছড়া আমাদের চারপাশের নানা দৃশ্যকে ছবির মতো এঁকে দেয় শিশুমনে। নদীর জল যে টলমল করে বা নদীতে নৌকা চলে এইসব তথ্যগুলো আলাদা করে শেখাতে হয় না। ছড়ার মধ্যে শুনতে শুনতে শিশুমনে একটি ভাবকল্পের সৃষ্টি হয়। ছড়া সহজেই দৃঢ়তর করতে পারে শিশুর কল্পনাশক্তিকে। যেমন- লেজ ঝোলা পাখি, বা বাদুড়ের বিয়েতে চামচিকার বাজনা বাজানো, অতিথিদের আপ্যায়ন ইত্যাদি।

ছড়ার সুর, ছন্দ ও ভাষা প্রয়োগের মধ্যে যে মেলবন্ধন রয়েছে তা শিশুমনে দোলা দেয়। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করে, তাই হাততালি দিয়ে নেচে গেয়ে, অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয় করে ছড়া আওড়াতে শিশু ভালবাসে। তাই শিশুতোষ ছড়া রচনার ক্ষেত্রে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সবার আগে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিশুমনের বাসনা উপলব্ধি করে, তাকে শিশুর মনতোষময় ভাষা শৈলীতে উপস্থাপন করা ছড়াকারের মৌল দায়।

শিশুতোষ ছড়া শিশুমনের জন্য খুব উপকারী। শিশুতোষ কবিতা শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য খুবই কার্যকর। এছাড়া মানসিক যোগাযোগ ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে এটি। ছোট্ট একটি ছড়ার মাধ্যমে শিশুর কাছে গোটা বিশ্বকে তুলে ধরা যায়। মা- বাবা যখন শিশুকে ছড়া গান শোনান, তখন শিশুর সঙ্গে তাদের একটি আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়। শিশুমনে যদি কোনও ভয় ভীতি জড়তা থেকে থাকে তখন সেটা দূরীভূত হয় সহজে।

ছড়া সাহিত্যের প্রাচীনতম মাধ্যম। কেউ কেউ আবার ছড়া বাংলা সাহিত্যের আদি মাধ্যমও বলেছেন।

ছড়া শিশু মনে গভীর রেখাপাত করে। সার্বিকভাবে ছড়ার গুরুত্বের বিষয়ে যে বিষয়গুলো শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠে তা হচ্ছে- ছড়া শিশুকে আনন্দ দেয়, বলতে উৎসাহী করে, প্রমিত উচ্চারণ-রীতি অনুসরণে সহায়তা করে, শিশুর মধ্যে ছন্দবোধ সৃষ্টি করে, কল্পনা বিস্তারে সহায়তা করে, শিশুর বাক্য যোজনায় উৎসাহী করে তোলে, সৃজনশীল হতে সাহায্য করে, নতুন নতুন শব্দ শিখনে সহায়তা করে, দৃশ্যমান জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে, শিশুকে শোনা, বলা, পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে, ভাষা গঠন ও অর্জন উভয় পর্যায়েই ছড়া শিশুর ভাষা- দক্ষতা বিকাশের অন্যতম সহায়ক উপায়। এছাড়াও ছড়ার দ্যোতনা শিশুকে সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করে। তাই ছড়া সাহিত্যকে সংরক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। যাতে করে আগামীদিনের শিশুদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য ছড়া আরও বেশি সহায়ক হতে পারে।

ষোল আনাই মিছে

সুকুমার রায়

বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই চড়ি সখের বোটে,
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জীবন মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।"

খানিক বাদে কহেন বাবু, "বলতো দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেমন আসে পাহাড় থেকে নেবে?
বলতো কেন লবণ পোরা সাগর ভরা পানি?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তা কি
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি!"

আবার ভেবে কহেন বাবু, "বলতো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো?
বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বলব কি আর বলব তোরে কি তা,
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকাখানি ডুবলো বুঝি দুলে!
মাঝিরে কন, "একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবলো নাকি নৌকা এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?"- মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবন খানা ষোল আনাই মিছে।

কবি পরিচিতি

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর কলকাতায় সুকুমার রায়ের জন্ম। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও মাতা বিধুমুখী দেবী। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন কলকাতা সিটি কলেজ থেকে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর বিখ্যাত ননসেন্স (আবোলতাবোল) ক্লাব। তিনি ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ' স্কলারশিপ লাভ করে ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। সেখানে লন্ডনের স্কুল অব ফটো এনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফিতে ভর্তি হন। পরের বছর তিনি বিশেষ ছাত্র হিসেবে ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অব টেকনোলজিতে যোগ দেন। এই সময় বিখ্যাত কোয়েস্ট পত্রিকায় 'দ্য স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পিতা উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় মাসিক সন্দেশ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় ১৯১৩ সালের মে মাসে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এফআরপিএস লাভ করে সুকুমার রায় কলকাতায় ফিরে এসে পিতার 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'-এ যোগ দেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় শ্রীমতী সুপ্রভা গুপ্তের। বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায় তাঁদের পুত্র। ১৯১৪ সালে সুকুমার রায়ের যে লেখাটি সন্দেশ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় তার নাম 'খিচুড়ি'। এরপর কাঠবুড়ো, ছায়াবাজি, গোঁফচুরি, বিজ্ঞান শিক্ষা, খুড়োর কল প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

১৯১৫ সালে পিতা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদনার ভার বর্তায় সুকুমার রায়ের ওপর। ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আট বছর তিনি এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করে শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। একই সঙ্গে 'সান্ডে ক্লাব' নামেও একটি সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। রোগশয্যাতে কাটে তাঁর শেষ আড়াই বছর। সেই অবস্থায় তিনি অনেক লেখা এবং ছবি আঁকার কাজ শেষ করেন, যেগুলোকে নির্দ্বিধায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে করা হয়।

মূলভাব

সুকুমার রায়ের এই কবিতায় দেখা যায় একজন বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই নৌকায় চড়ে বসেন। সেখানে মাঝির সাথে তার কথোপকথন হয়। মূলত মাঝি ও তার কথোপকথনকে কেন্দ্র করে এই কবিতা বা ছড়া।

বাবু মশাই একজন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানুষ। সূর্য কেন ওঠে, জোয়ার কেন আসে, সাগরের পানিতে লবণ কেন, আকাশ নীল দেখায় কেন, সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগার কারণ ইত্যাকার কঠিন জ্ঞান তিনি আয়ত্বে এনেছেন। তবে মহাবিশ্বের সমগ্র জ্ঞানরাজির মধ্যে যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একটা অংশ। বাবু মশাই এই বিষয়টি মাথায় রাখতে পারেন নি। তিনি তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যুক্তিবাদের জ্ঞানকেই সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন। মাঝি একজন অশিক্ষিতি লোক বলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার অল্প। বাবু মশাই সেটা জেনেও মাঝিকে প্রশ্ন করে বিব্রত করেন। এখনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানযুক্ত বাবু মশাইয়ের নিচু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার অর্জিত জ্ঞানের অহংকারে অন্ধ হয়ে, মাঝির অর্জিত জ্ঞানকে তাচ্ছিল্য করে প্রশ্ন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মাঝিকে মুর্খ বলেন। এবং বলেন তার জীবন বারো আনাই মিছে।

এরপর ঝড় ওঠে। নৌকা দুলতে থাকে বাবু মশাই ভীত হন। মাঝি তখন বাবু মশাইকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি সাঁতার জানেন কি না। তিনি না সূচক উত্তর দেন। তখন মাঝি প্রতিশোধমূলকভাবে বাবু মশাইয়ের জীবন যে ষোলো আনাই মাটি তাও বলে। মাঝির এই উক্তি বাবু মশাইয়ের প্রতি লেখকেরই উক্তি। লেখক এর মাধ্যমে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাঁর জীবনকে পূর্ণতা দিতে পারেনি। সুকুমার রায় এখানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যুক্তিবাদই যে সকল জ্ঞানের মূলমন্ত্র নয় সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়

তিনজন মাল্লা

চৌপর দিন্-ভর

দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়

জঙ্গল-জঞ্জাল,

জলময় শৈবাল

পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর

ঐ চর জাগছে,

বন-হাঁস ডিম তার

শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ–ওই ডুব

দ্যায় পানকৌটি,

দ্যায় ডুব টুপ্‌টুপ

ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক কলসীর

বকবক শোন্ গো,

ঘোমটায় ফাঁক রয়

মন উন্মন্ গো।

তিনদাঁড় ছিপখান্

মন্থর যাচ্ছে,

তিন জন মাল্ল ায়

কোন্ গান গাচ্ছে?

রূপশালি ধান বুঝি

এই দেশে সৃষ্টি,

ধূপছায়া যার শাড়ি

তার হাসি মিষ্টি।

কবি পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের জাদুকর' হিসেবে খ্যাত। নানা ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং বাংলা ও বিদেশি নানা ছন্দ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, নতুন নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেছেন।

কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র-অনুসারী কবি। কিন্তু কবিতার ছন্দে বৈচিত্র্য এনে তিনি বাংলা কাব্যে পৃথক স্থান করে নেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেকগুলো ভাষা জানতেন। বাংলা ভাষায় তিনি প্রচুর অনুবাদ রচনা করেন। তীর্থসলিল ও তীর্থবেণু গ্রন্থ দুটি তাঁর অনূদিত কবিতার সংকলন। তিনি কোরআনের বাণীকে বাংলা কবিতায় রূপ দিয়ে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন, মণিমঞ্জুষা, অভ্র আবির, বিদায় আরতি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

উপন্যাস, গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ রচনা ও অনুবাদ করলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর প্রায় ১৬টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর কবিতাগুলো শিশু কবিতা নামে একটি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মাত্র চলিশ্ল বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করেন।

মূলভাব

নৌকায় তিনটি দাঁড় নিয়ে তিনজন মাঝি দিনের চার প্রহরেই দূর পাল্লায় যাচ্ছে। তাদের নৌকার গতি অতি দ্রুত। চলার পথে মাঝিরা নদীর দুই তীরের ঝোপঝাড়, জঙ্গল পার হয়ে যাচ্ছে। পানিতে শৈবালকে সবুজ পান্নার টাঁকশালের মতো লাগছে। মাঝিরা যেতে যেতে আরও দেখছে বুনো হাঁস তার ডিম কিভাবে শ্যাওলা দিয়ে ঢাকছে। পানকৌড়ি এবং ঘোমটা পরা বউ টুপ্‌টুপ্ করে পানিতে ডুব দিচ্ছে। দুজনের পানিতে ডুব দেওয়ার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। গাঁয়ের বধূর কলসিতে পানি ভরার আওয়াজ হচ্ছে। ঘোমটার ফাঁকে বউটির মন উন্মনা হয়ে আছে। অবশেষে নৌকার মাঝিরা তাদের গতি ধীর করে এবং গান ধরে। তারা বাংলাদেশের রূপশালি ধান এবং ধূপছায়া শাড়ি পরিহিত মিষ্টি হাসির বাংলার নারীর স্তুতি গাইছে সুরে সুরে।

ভাবরূপ ও শিল্পরূপ

রবীন্দ্র-স্নেহচ্ছায়ায় যেসব কবি কাব্যসৃষ্টিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানদৃষ্টি ও তথ্যনিষ্ঠা তিনি উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন বলে কাব্যভাবনায় তার প্রভাব পড়ে। তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে বস্তুজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ইতিহাসবোধ, স্বদেশচিন্তা, প্রাত্যহিক জীবনাচরণ ও ভাষাবিজ্ঞান–সর্বক্ষেত্রে তাঁর কাব্যভাবনার বিচরণ ছিল বন্ধনহীন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাধক ও সমাজ-সচেতন ব্যক্তি। এ কারণে তাঁর কাব্যে বিজ্ঞানানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের বিচিত্র বিষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মানবতাবোধ ও স্বদেশপ্রেম তাঁর কবিতার মহোত্তম উপাদান বলে গণ্য করা হয়। এই স্বতন্ত্র জীবনবোধ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রবলয়ের কবিদের থেকে পৃথক মর্যাদা প্রদান করেছে এবং তাঁর বস্তুচেতনা ও ইতিহাসবোধের কারণে রবীন্দ্রোত্তর কবিরা তাঁর কাব্যভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের জাদুকর' বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন। বাংলা কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য আনয়নে তিনি সংস্কৃত ও নানা ভাষার কবিতা থেকে অনুবাদে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। আরবি, ফারসি ও লোকজ শব্দের অকৃপণ ব্যবহারে তিনি বাংলা কবিতার নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ এবং বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাকচাতুর্য ও বাগ্বৈদগ্ধ্যে তাঁর কবিতা চিত্ররূপময়, ছন্দের দোলায় কম্পমান ও গতিশীল। তাঁর 'দূরের পাল্লা', 'পালকির গান' ও অন্যান্য অসংখ্য কবিতা যেন গ্রামবাংলার জীবন ও প্রকৃতির জীবন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মেলা। 'দূরের পাল্লা' কবিতাটিকে স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বদ্ধাক্ষর এবং মুক্তাক্ষরকে এক মাত্রা হিসেবে পড়া চলে। পরিশেষে বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সন্দেহাতীতভাবে রবীন্দ্রবলয়ের কবি, তবে রবীন্দ্র-অনুকারী নন, মুক্তবুদ্ধি ও শুভবুদ্ধির চর্চায় তিনি স্বতন্ত্র এবং তিরিশোত্তর কবিদের পূর্বসূরি।

অধ্যায় ৫

কবিতা

কবিতা কী ?

কবিতার আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে কবিতার স্বরূপ জানা প্রয়োজন; তবে, কবিতা আসলে কী এবং কীভাবে কবিতা কবির হৃদয়ে জন্মলাভ করে তার সর্বজনমান্য সংজ্ঞা নেই। অনেকেই অনেক রকমভাবে কবিতার জন্মরহস্য বর্ণনা করেছেন। তবে এ সত্য অনস্বীকার্য যে, কবিচিত্তে যে ভাববিধুর আবেগ তৈরি হয়, কবিতা সেই আবেগের রসায়নে সৃষ্ট আনন্দ-বেদনার ফসল। তাই বলা হয়ে থাকে, 'কবির বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ই কবিতার জন্মভূমি'। আত্মগত ভাব-বিহ্বলতা কবিতা নয়, বরং বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, বস্তুজগৎ ও মনোজগতের সম্মিলনে যখন কবিমন আন্দোলিত হয়, তখন সে আবেগকে কবি তাঁর অনুভূতি-স্নিগ্ধ কল্পনায় অনন্য অবয়ব দান করে কবিতা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ ভাবনাকে যথার্থ শব্দমালা দিয়ে কবি ছন্দরূপে ধারণ করেন। তাই কোল্‌রিজ্‌ কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: Best words in best order-ই কবিতা। একথা ঠিক যে, অবিন্যস্ত শব্দের সমাহারে কবিতা হয় না। বরং অপরিহার্য শব্দের সুবিন্যাসে কবিভাবনা যখন রসাত্মক, চিত্ররূপময় ও গতিময় হয় তখন কাব্য হয়। সুতরাং রসসমৃদ্ধ বাক্যই কাব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

অন্তর হতে আহরি বচন,
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

কবিতার আলোচনায় মোহিতলাল মজুমদার বলেন, কাব্যলক্ষ্মীর সাথে আত্মার রতিসুখসম্ভোগকালে রস-মূর্চ্ছিত মানবের 'দিব্যভাববিধুর ভাষ' কবিতা নয়, বরং বস্তুজগতের ধূলিমলিন জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্না আনন্দ-বেদনা কবির মনরসে জারিত হয়ে যখন অসাধারণ ও অনন্য শরীরী রূপ পায় তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে। কাব্যের এ রূপময়তা বস্তুত ধ্যানমগ্ন কবি-আত্মারই সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ। কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণে ম্যাথু আর্নল্ড এর বক্তব্যও অনুরূপ–'poetry is emotion recollected in tranquility', তবে আবেগ বা অধ্যাস আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়, এ আবেগ বস্তুসঞ্জাত ও কবিচিত্ত দ্বারা জারিত ভাবসত্য।

এ রকম সংজ্ঞা, প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ, যেমন–অ্যারিস্টটল, লঙিনুস বা হোরেস কিংবা প্রমুখ তাঁদের কাব্যতত্ত্বে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতেও অগণিত বিদ্বজ্জন কবিতার নানা ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে এ সত্য প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন, অর্থ, শব্দ, ছন্দোবদ্ধ অভিজ্ঞতার আবেগিক প্রকাশ বা চেতনাপ্রবাহের জাগরণই কবিতা। তবু বলা ভালো যে, কবিতার আসলে কোনো সর্বজনসিদ্ধ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বিচিত্র ধারার কবিবৃন্দ এমন বহুরূপী কবিতা রচনা করেছেন, যেমন–হোমারের ওডিসি, জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, দান্তের ডিভাইন কমেডি, গ্যেটের ফাউস্ট, কোল্‌রিজের কুবলা খান, জন কিটসের ওড অন এ গ্রেসিয়ান আর্ন, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা–কারো সঙ্গে কাউকে একসূত্রে গ্রথিত করা যায় না। তবু বর্ণিত সবগুলো বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাব্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। সুতরাং বলা যায়–কবিতা বহু রকমের, কবিতাকে সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা বৃথাশ্রম মাত্র; বরং কবিতা উপলব্ধির ও আত্মার বোধিবৃক্ষ, যেখানে দুদণ্ড শান্তি মেলে। এ শান্তি কেবল নিজের আনন্দ-বেদনার জন্য নয়, সমাজ ও মানুষের নিকট স্বীয় দায়বদ্ধতার জন্যও বটে।

কবিতার শ্রেণি

কবিতা অনেক রকমের। রস ও রূপতত্ত্বের বিচারে কবিতার শ্রেণিকরণ করা হয়:

ক) বস্তুনিষ্ঠ কবিতা: গাথাকাহিনি, মহাকাব্য, রূপক-ব্যঙ্গ-গীতিকাব্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত মহাকাব্যসমূহ, মঙ্গলকাব্য এবং বিভিন্ন প্রণয়োপাখ্যান ইত্যাদি এই জাতীয় কাব্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

খ) গীতি কবিতা: ভক্তিমূলক, স্বদেশপ্রেমমূলক, প্রেম ও প্রকৃতিমূলক কবিতা। সনেট, স্তোত্র, শোকগীতি, বাংলা বৈষ্ণব কবিতা এ গোত্রের কবিতা। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী, বিহারীলাল চক্রবর্তীর সাধের আসন, সারদামঙ্গল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেট, চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি এ পর্যায়ের কবিতা।

কবিতা পাঠ ও কবিতা লিখন

কবিতা লেখা ও কবিগুণ সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, অনেকে কবিতা লেখেন, তবে 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' এ বাক্যের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য হচ্ছে, কবিতা লেখা সহজ কাজ নয়। এজন্য সৃজনী প্রতিভার সঙ্গে প্রয়োজন একনিষ্ঠ চর্চা। তবে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, কেবল প্রতিভা ও কেবল চর্চা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কবিখ্যাতি এনে দিতে পারে না। এ কারণে শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে লিখন-দক্ষতা বৃদ্ধিরও অনুশীলন করানো হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের অবিরাম কবিতাপাঠের সঙ্গে কাব্যভাষা, কবিতার ছন্দ ও কবিতা শ্রচতলিখন ইত্যাদি নিরন্তর চর্চার অধীনে রাখলে তারা কবিতার পঠন, আবৃত্তি এবং ছন্দ ও উপমা ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের কল্পনা ও ভাবনাকে লিখনে রূপদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কবিতার ভাব-ভাষা-প্রকরণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং শ্রেণি-শিক্ষণে তা সৃজনশীলভাবে শিশুদের জন্য ব্যবহার করে তাদের ভাষা-দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলা কবিতার রয়েছে এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। চর্যাপদ থেকে বড়ু চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বিহারীলাল, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরচ্ল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ থেকে শামসুর রাহমান পর্যন্ত আমাদের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। হাজার বছরের এই ঐতিহ্যের মধ্যমণি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দীর্ঘ ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ততর রূপরেখা নিচে প্রদান করা হলো।

হাজার বছরের বাংলা কবিতার রূপরেখা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক–এই তিন যুগে বিভক্ত। প্রাচীন ও মধ্য যুগের সবটা জুড়েই হয়েছে কবিতার চর্চা। গদ্য বলতে যা বুঝি তা আধুনিক যুগের ফসল। প্রাচীন ও মধ্য যুগে বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা সাহিত্যমূল্যে নগণ্য। কিন্তু আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের উদ্ভবের সঙ্গে যেমন এর সমৃদ্ধি ঘটেছে, তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতারও বহুমাত্রিক বিকাশ সাধিত হয়েছে। এ নিবন্ধে বাংলা কবিতার ভাবগত ও কালগত সংক্ষিপ্ততর রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। বাংলা কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময় পরিসরে বৌদ্ধ সাধক ও তান্ত্রিকগণ রচনা করেন। এগুলো বৌদ্ধদের ধর্মসংগীত হলেও চর্যাপদে তৎকালীন সাধারণ (সময়ে সময়ে হীন অন্ত্যজ) বাঙালির প্রতিদিনের ধূলিমলিন জীবনচিত্র, সুখদুঃখ, হাসিকান্নার টুকরো টুকরো রেখাচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দার্শনিকতা এবং আদিম বাংলা সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে' (শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ. ২৩) চর্যাপদ যুগোত্তর মহিমায় টিকে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যান্য যেসব কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বৈষ্ণব পদাবলী, নাথ সাহিত্য,

মুসলিম কবিদের রচিত কাব্য-কবিতা, বাউল গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলা কবিতার হাজার বছরের এ সমৃদ্ধ ভাণ্ডার বাঙালি জাতির গৌরবের ধন হলেও সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা কবিতা পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে ও ধর্মপ্রসঙ্গের গতানুগতিকতায় প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতার কালান্তর ঘটে উনিশ শতকের মধ্যপর্যায় থেকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৬), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) এবং কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯৫২) কাব্যসাধনায়। একালের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভাগুণে প্রাচীন ও মধ্য যুগের কবিতার গতানুগতিক ভাবকল্পনা ও রূপরীতি ছিন্ন করে এ সময় বিষয় ও প্রকরণে এক নতুন কবিতা জন্মলাভ করে। এ কারণে বাংলা কবিতার নবযুগের অগ্রদূত বলে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে গণ্য করা হয়। তিনি বাংলার নবচেতনার সার্থক প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাধর কবি ও আধুনিক নাটকের রচয়িতা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য *মেঘনাদবধ*-এর রচয়িতাও তিনি। পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কবিতায় তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনিই প্রথম সার্থক আধুনিক বাংলা নাটক, ট্রাজেডি, প্রহসন ও সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের সাধনায় বাংলা কাব্যসাহিত্য কালজয়ী মাত্রা পায়। জীবনচেতনায় নবীনতা, ত্রিলোকপ্রসারী ভাবকল্পনা, ভাষার আমূল সংস্কার ও নতুন শক্তির আবিষ্কার মধ্যযুগীয় সামান্যতা থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্ত করে তিনি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেন (ক্ষেত্র গুপ্ত : পৃ. ১১-২৫)। এ কারণে মধুসূদনকে যুগন্ধর কবি বলা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেভাবে প্রাচীন ও মধ্য যুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়, বাংলা সাহিত্যে তেমনটি হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অবশেষের ওপর পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের হাত ধরে আধুনিক সভ্যতার বিনির্মাণ সম্ভব হয়। বাংলাদেশে তা হয়নি বলে আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক অসমবিকশিত পরিবেশে মাইকেলের মতো কালজয়ী প্রতিভার পক্ষেও পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ধ্রুপদ সাহিত্যের ও ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন, স্বদেশবোধ ইত্যাদি নবজাগৃতির মূলমন্ত্রগুলো অনুধাবন করা সর্বাংশে সম্ভবপর হয়নি। সেই সময়ের অন্যান্য কবি সমসাময়িক ইতিহাসের কালচেতনা মাইকেলের মতো আত্মস্থ করতে সক্ষম হননি। ফলত মাইকেল সৃষ্ট মহাকাব্যিক বা বীরযুগটি সমসাময়িক কবিদের হাতে একটি কৃত্রিম ক্লাসিক যুগ হয়ে থেকে গেল। অপরপক্ষে প্রাচীন যুগের শেষ উত্তরাধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) দুর্মর প্রভাব সমকালীন অনেক কবিকে পশ্চাদ্মুখী করে রাখে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সত্ত্বেও, 'ভোরের পাখি' বিহারীলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় গীতিকবিতার সুরলহরী। নবীনচন্দ্র সেনও কিছুটা ব্যতিক্রমী। তবু এই বিচিত্রমুখী কবিদের হাত ধরেই আধুনিক বাংলা কবিতা বিবর্তিত হয়েছিল এবং একটি সেমি-ক্লাসিক্যাল অবয়ব ধারণ করেছিল। সুতরাং এ সময়কে পরিপূর্ণভাবে বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ বলা সমীচীন নয়, বরং আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্ব বলা সঙ্গত (তারাপদ মুখোপাধ্যায় : পৃ. ৩-৭)।

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে (১৮৩৫-১৮৯৪) বাংলা গীতিকবিতার জনক বলা হয়। তবু বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল সার্থক কবিখ্যাতিতে স্মরণীয় নন; নতুন সুরের প্রবর্তক হিসেবেই নন্দিত (তারাপদ মুখোপাধ্যায় : পৃ. ৩-৭)। বিহারীলালের হাতে ব্যক্তিহৃদয়ের হাহাকারমিশ্রিত গীতিকবিতার পূর্বাভাস লক্ষিত হলেও এর পূর্ণরূপ দর্শন সম্ভব হয় বিরলপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) মাত্র বার বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছর বয়স পর্যন্ত অবিরল ধারায় কবিতা, গল্প, সংগীত, নাটক, উপন্যাস এবং অনবদ্য গদ্য রচনা করে গেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ফলিয়েছেন সোনার ফসল, আর তাতে ভরে গেছে তাঁর সোনার তরী। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, আবেগের গভীরতা ও রোমান্টিকতার অভিসার, ইন্দ্রিয়জগতের সাথে ইন্দ্রিয়াতীতের মিলন, সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের মিলনক্রীড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত একক কালে কোনো কবির মধ্যে দেখা যায়নি। বিশ্বসাহিত্যের কোনো কবিপ্রতিভার সঙ্গেও তাঁর তুলনা হয় না। গ্যেটে, হোমার, দান্তে, রবীন্দ্রনাথ–এঁরা কেউ কারো সঙ্গে তুলনীয় নন। সৃষ্টিশীলতার বহুমুখিতার প্রশ্নে গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের তুলনা চলে। গ্যেটেও মুখ্যত সাহিত্যিক এবং তাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মতোই বিচিত্রমুখী–গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত; জার্মান সাহিত্যের এমন কোনো বিভাগ বা শাখা প্রশাখা নেই, যার উপর তাঁর প্রতিভা আপন স্বাক্ষর রাখেনি। রবীন্দ্রনাথের বিশাল শিল্পভুবনকে ১. কাব্য-কবিতা, ২.নাটক, কাব্যনাটক ও নাট্যকাব্য, ৩.উপন্যাস ও ছোটগল্প, ৪. প্রবন্ধ-নিবন্ধ শীর্ষক ধারায় শ্রেণিকরণ করা যায়। আবার বিষয়, ভাববস্তু ও প্রকরণের নিরিখে একেকটি শ্রেণিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়, যেমন : নাটকের কথা যদি ভাবা হয় তাহলে ক. কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য, খ. নিয়মানুগ নাটক, গ. রঙ্গনাট্য, ঘ. রূপক ও সাংকেতিক তত্ত্বনাটক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিষয় ও ভাবগত দিক বিচার করলে এরও বৈচিত্র্যের সীমা পাঠককে অবাক করবে। তবে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কাব্যপ্রতিভার এমন সর্বত্রসঞ্চারী প্রতিভা বিশ্বে একান্ত বিরল।

রবীন্দ্র-স্নেহচ্ছায়ায় যেসব কবি কাব্যসৃষ্টিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানদৃষ্টি ও তথ্যনিষ্ঠা তিনি উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন বলে কাব্যভাবনায় তার প্রভাব পড়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর বস্তুজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ইতিহাসবোধ, স্বদেশচিন্তা, প্রাত্যহিক জীবনাচরণ ও ভাষাবিজ্ঞান-সর্বক্ষেত্রে তাঁর কাব্যভাবনার বিচরণ ছিল বন্ধনহীন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাধক ও সমাজসচেতন ব্যক্তি। এ কারণে তাঁর কাব্যে বিজ্ঞানানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের বিচিত্র বিষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মানবতাবোধ ও স্বদেশপ্রেম তাঁর কবিতার মহোত্তম উপাদান বলে গণ্য করা হয়। এই স্বতন্ত্র জীবনবোধ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রবলয়ের কবিদের থেকে পৃথক মর্যাদা প্রদান করে এবং তাঁর বস্তুচেতনা ও ইতিহাসবোধের কারণে রবীন্দ্রোত্তর কবিদের তাঁর কাব্যভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ছন্দের রাজা ও ছন্দের জাদুকর বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন। বাংলা কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য আনয়নে তিনি নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও লোকজ শব্দের অকৃপণ ব্যবহারে তিনি বাংলা কবিতার নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ ও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাক্‌চাতুর্য ও বাকবৈদগ্ধ্যে তাঁর কবিতা চিত্ররূপময়, ছন্দের দোলায় কম্পমান ও গতিশীল। তাঁর 'দূরের পাল্লা', 'পালকির গান' ও অন্যান্য অসংখ্য কবিতায় গ্রামবাংলার জীবন ও প্রকৃতির জীবন্ত ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সন্দেহাতীতভাবে রবীন্দ্রবলয়ের কবি, তবে রবীন্দ্র-অনুকারী নন, মুক্তবুদ্ধি ও শুভবুদ্ধির চর্চায় তিনি স্বতন্ত্র এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিরিশোত্তর কবিদের পূর্বসূরি।

বাংলা কবিতার আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। রবীন্দ্রযুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিচিত্র ব্যাপকতায় তখন মধ্যগগনের সূর্যের মতো দীপ্যমান, তখন নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো পুচ্ছ নাচিয়ে। কণ্ঠে তাঁর বিদ্রোহের সুর। দুটি মহাসমরের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব যখন অস্থির, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনিশ্চয়তা আর অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত, এ রকম সময়েই কাজী নজরুল ইসলাম উৎপীড়িত মানবতার মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বিদ্রোহের ডাক দেন। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ছিল তাঁর কবিহৃদয়ের

বহ্নিজ্বালার ক্ষোভ ও বিক্ষোভ। তাঁর *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশী*, *ভাঙার গান*, *প্রলয়-শিখা*, *সাম্যবাদী* ইত্যাদি প্রতিবাদের কাব্য। সাম্য, স্বাধীনতা, মানবতা ও মুক্তির মন্ত্রে তাঁর কবিতা বজ্রাগ্নির মতো জ্বলে উঠেছিল। রবীন্দ্রযুগে উন্নতশির কবির আবির্ভাব তাই সকলকে সচকিত করেছিল।

বিদ্রোহই নজরুলের একমাত্র সত্তা নয়। তাঁর এক হাতে বাঁশের বাঁশরী আর অন্য হাতে রণতূর্য। তাঁর প্রতিভাকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে তাঁর কঠোর ও কোমলের, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার যথার্থ সমন্বিত রূপ আমাদের বুঝতে হবে। তাঁর মানসে শক্তি ও সৌন্দর্যের যথার্থ মিলন ঘটেছিল। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা ও প্রেমসত্তার মিলনমধুর প্রকাশ আমরা লক্ষ করি তাঁর প্রেমের কবিতা ও বিদ্রোহের কবিতায়। তাঁর *দোলনচাঁপা*, *ছায়ানট*, *চক্রবাক*, *সিন্ধুহিন্দোল* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রেমভাবে যেমন কম্পমান, তেমনি আবার *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশী* ও অন্যান্য বিদ্রোহাত্মক কবিতায় দুর্বিনীত ও উন্নতশির। প্রেম ও বিদ্রোহ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমী, সাম্যবাদী এবং আন্তরিক।

শব্দ ব্যবহারে নজরুল ইসলাম ছিলেন বাস্তববাদী। কবিতার জন্য যে শব্দ অপরিহার্য–হোক সে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত বা যেকোনো ভাষার শব্দ–কবি অকুণ্ঠচিত্তে তা ব্যবহার করেছেন। যেখানে কণ্ঠস্বর উদাত্ত ও বলিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেখানে তাঁর নির্বাচিত শব্দাবলি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে। হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশের ভাষার মধ্যে আছে নম্রতা। তাঁর ভাষায় আছে তৎসম শব্দ ও বিদেশি শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ। মুসলিম ইতিহাস, ইসলাম ধর্ম বা ঐতিহ্যচেতনা রূপায়ণের অনুষঙ্গ হিসেবে আরবি, ফারসি শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষণীয়। হিন্দু-ঐতিহ্য রূপায়ণে পুরাণপ্রসঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট মিথিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নির্দ্বিধায়।

কাজী নজরুলের এ ইতিহাসচেতনা, সংগ্রামশীলতা, মানবিকতা, সাম্যচিন্তা কেবল রবীন্দ্রযুগের অপরাপর কবি–করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ অতিক্রম করতে পারেননি, বরং তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিকুলকেও অনেকাংশে আচ্ছন্ন করেছে।

রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত "আধুনিক বাংলা কবিতাকে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি" (বুদ্ধদেব বসু : আধুনিক বাংলা কবিতা, পৃ. ১০)। আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতে, কালের দিক থেকে এ কবিতা বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী মন্দা, নগরসভ্যতার যান্ত্রিকতা, সত্য-শুভ্র-সুন্দরের পরিবর্তে লিবিডোর অসংবদ্ধতা, আত্মবিরোধ, অনিকেতবোধ, নৈরাশ্য ও শূন্যতা, বিশ্বাসের ভিত ধসে পড়ায় নঞর্থকতায় আত্মবিলয়, মার্ক্সীয় দর্শনের আলোকে নতুন সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টিরহস্যের ধারণা বদলে যাওয়া এবং ঈশ্বর ও প্রথাগত ধর্মে অবিশ্বাস মানুষের জীবনমূলের শিকড় উপড়ে ফেলে (দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃ. ১২-১৫)। তিরিশোত্তর আধুনিক কবিতায় এই উন্মূল জীবনের চালচিত্র ধরা পড়েছে। ফলে এ কবিতার ভাববস্তু ও শিল্পপ্রকরণ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। এর ভাববস্তুর সঙ্গে শৈলী বা প্রকরণ অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত থাকে; এ কারণে তখনকার কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠবও হয়ে পড়ে ভিন্নতর লক্ষণাক্রান্ত।

বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ থাকায় গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলিত শব্দ, লোকজ শব্দ, বিদেশি শব্দের ব্যবহার হয় অকুণ্ঠ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ ও মিথের ব্যবহার, প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর

এবং মধ্যমিলের প্রচলনে বাংলা কবিতার মেরুদণ্ড শক্ত হয় এবং গদ্যময় জীবনের আবেগ ও নিরাবেগ ধারণার উপযোগী হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, আধুনিক বাংলা কবিতা ভাববস্তু ও আঙ্গিক বিচারে বিশ্বজনীন রূপ পায়। একালে যেসব কবি নতুন কাব্যধারার সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তিরিশের কালের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। *ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা* ও *রূপসীবাংলা* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন, তবে প্রাথমিক স্তরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং অন্যান্য গীতিকবির নতুন সুর, বাস্তবচেতনা, স্বদেশবোধ তাঁকে আকর্ষিত করেছিল। অচিরেই জীবনানন্দ দাশসহ তিরিশের কবিরা পাশ্চাত্যসূত্র থেকে জীবনরস সংগ্রহ করে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। এভাবে বাংলা কবিতায় পুরাতনকে অতিক্রম করে নতুনের জয়ধ্বজা উত্তোলিত হলো। কবি জীবনানন্দ দাশও এমনই এক নতুন সুর ও ছন্দ নিয়ে আবির্ভূত হন কাব্যজগতে। এ জগৎ দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ও যুদ্ধোত্তর সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়ে বিমর্ষ। পুঁজিবাদ ও যন্ত্রসভ্যতার দানবীয় শক্তির নিকট মানুষের পরাভব, পরাধীনতা, নীতিধর্ম-সত্যসুন্দরের ক্ষয়িষ্ণুতা জীবনানন্দ দাশকে যন্ত্রণাবিদ্ধ ও রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাই সঙ্গত কারণেই বলেছেন, জীবনানন্দ দাশ 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি'। এ কারণেই তাঁর সহজ কাব্যভাষার অভ্যন্তরে এক দুর্জ্ঞেয় কুয়াশার বিভ্রম তৈরি হয় বা তাঁর কবিতার অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক ধরনের দুর্বোধ্যতা অনুভূত হয়। এ দুর্বোধ্যতা জীবনানন্দের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ পরিব্যাপ্ত করে তাঁর কাব্যভাষা বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।

তবে এ সত্য অনস্বীকার্য, তাঁর কবিতায় যেমন বিশ্বময় বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত সুর ধ্বনিত হয়েছে তেমনি বাংলাদেশের প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ও জীবনচিত্র জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম এক স্বতন্ত্র রূপে সংহত ও নিরাবেগ পূর্ণতা সৃষ্টি করেছে। স্পষ্ট উচ্চারণে জীবনানন্দ দাশ বলতে পেরেছেন : 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।' *রূপসী বাংলা* ও *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার জল-হাওয়ামাটি পরাবাস্তব শিল্পরূপে যেমন নির্মেদ আবেগ প্রকাশ করেছে, তেমনি *মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যে সাম্রাজ্যগ্রাসী সমকালের মসিলিপ্ত সময়কে ধারণ করা হয়েছে ইতিহাসচেতনা, কালচেতনা ও মৃত্যুচেতনাকে ইন্দ্রিয়ঘন ও চিত্ররূপময় ইমপ্রেশনিস্ট অবয়বে। দীপ্তি ত্রিপাঠী যথার্থই বলেছেন, ইমপ্রেশনিস্ট ছবির মতো জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠকের কাছ থেকে একটি দূরত্ব সৃষ্ট করে রাখে, তাঁর কবিতা কাছ থেকে বোঝা যায় না, অসংলগ্ন ছেঁড়া ছেঁড়া রেখার টানের মতো, কিছুটা হয়তো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, কিন্তু কবিতা পাঠের শেষে একটা গুঞ্জন মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই গুঞ্জনই শেষ পর্যন্ত রেখাগুলিকে সংলগ্ন করে পৌঁছে দেয় অর্থের উপকূলে। জীবনানন্দ দাশ একদিকে যেমন তাঁর যুগের প্রতিনিধি, অন্যদিকে তিনি যুগোত্তর সত্যেরও সাধক। জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি।

বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্য

বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলাদেশের কবিতার যাত্রা শুরু। যে আধিপত্য নিয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগে বাংলা কবিতা দীপ্যমান ছিল, বাংলাদেশ পর্বে তা আরও সমৃদ্ধতর ও বিস্তৃত হয়। শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০১-১৯৮৩), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), মহীউদ্দীন (১৯০৬-১৯৭৫), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯১০-১৯৮৩), আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), মতিউল ইসলাম (১৯১৪-১৯৮৪), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫), তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯), আবুল হোসেন (১৯২১-), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), সানাউল হক (১৯২৪-১৯৮৩), আবদুল গণি হাজারী (১৯২৬১৯৭৬), ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭−), ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০০৩), জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮), আল মাহমুদ (১৯৩৬-), ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯২৯-২০০৮), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আবদুস সাত্তার (১৯৩১-২০০০), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৬), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-), বন্দে আলী মিয়া (১৯৩৭-১৯৭৯) প্রমুখ বাংলাদেশের কবিতাভুবনকে ঋদ্ধ করেছেন। বর্তমান সংকলনে কেবলমাত্র এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমলকানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

কবি পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকে কলিকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজে তিনি পাশ্চাত্যবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মোহে প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরচ করেন। অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে হলে বিদেশি ভাষায় তা সম্ভব নয়। শুরু হয় তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চা। বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাধর কবি ও নাট্যকার হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মাইকেলই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্যের রচয়িতা। পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কবিতায় তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনিই প্রথম সার্থক আধুনিক বাংলা নাটক, ট্রাজেডি, প্রহসন ও সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের সাধনায় বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনচেতনায় নবীনতা, ত্রিলোকপ্রসারী কল্পনা, ভাষার আমূল সংস্কার ও নতুন শক্তির আবিষ্কার মধ্যযুগীয় সামান্যতা থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্ত করে তিনি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেন। এ কারণে মধুসূদনকে যুগন্ধর কবি বলা হয়। মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬), শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ইত্যাদি তাঁরউল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। ১৮৭৩ সালের বাংলার মহাকবি ও বিশ্বনাগরিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরলোকগমন করেন।

মূলভাব

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অন্যতম কবিতা 'বঙ্গভাষা'য় কবির অন্তর্লোকের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা এবং আত্মপরিচয় উন্মোচন। পাশ্চাত্য

সাহিত্যের প্রতি অন্ধমোহে কবি কাব্যচর্চার সূচনাতে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশি ভাষায় কাব্যচর্চা শুরচ করেন। ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি আশানুরূপ খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি। তখন হিতৈষীদের অনুরোধ এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে কবি বাংলা ভাষায় কাব্যরচনা শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, পরধন-লোভে উন্মত্ত হওয়া এক ধরনের উঞ্ছবৃত্তি মাত্র। এভাবে আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে কবি নিজের জীবনের ভ্রম সংশোধনের সঠিক পথ চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। পরভাষায় কাব্যচর্চাকে পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি সুতরাং বরণযোগ্য নয় বলে তিনি আত্মধিক্কার জানিয়েছেন। মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় এ ফিরে আসাকে কবি অলৌকিক স্বপ্ন-বারতা বলে মেনেছেন। স্বপ্নাদেশ পালন করে তিনি মাতৃভাষার মণিপূর্ণ খনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন এবং পরিশেষে নিজ ভাষার মাধ্যমে তিনি তাঁর দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ ও কাব্যচিন্তার চরম প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন।

'বঙ্গভাষা'র বৈশিষ্ট্য

ইউরোপ-প্রবাসে কবি মধুসূদনের জীবনের অন্যতম মুখ্য ঘটনা চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা। এ জাতীয় কবিতায় কবির অন্তর্জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রকরণের দিক থেকে এটি একটি সার্থক সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। এ কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে কবির অনুশোচনা-দগ্ধ আত্মার করুণ আর্তনাদ। এখানে প্রবাসী কবির মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। হঠাৎ করে যেন তাঁর আত্মচেতনা জেগেছে। পরদেশে পরভাষায় কাব্যচর্চা কখনো কোনো সার্থকতা বা সম্মান বয়ে আনতে পারে না, বরং এ এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি। তাই ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তিনি আজ আত্মগ্লানিতে ভুগছেন।

কবিতার উল্লিখিত ভাববস্তুটি সনেটের নিখুঁত বুননের মধ্যে অনন্য শিল্পরূপ পেয়েছে–বাংলায় যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। কবিতাটি অষ্টক ও ষটক দুই অংশে বিভক্ত। একটি মূল ভাবকে দুটি অংশে সঞ্চারিত করে একটি অখণ্ডআবেগ সৃষ্টি করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষযোগ্য যে, আলোচ্য কবিতার অষ্টক অংশে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা করার ফলে তাঁর যে আত্মক্ষয় হয়েছে তা তুলে ধরেছেন এবং ষটক অংশে সেই ক্ষতি বা ভুল সংশোধনে আত্মনিয়োগ করে শেষে সাফল্যলাভের তৃপ্তিসহ মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কবি সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ এবং অন্তরের ভাবপ্রকাশ একই সূত্রে ব্যঞ্জনাধর্মী একটি এককে রূপান্তরতি করতে পেরেছেন।

একটি অখণ্ড ভাবের প্রকাশ সনেটের এই বৈশিষ্ট্য 'বঙ্গভাষা' কবিতায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। কবিহৃদয়ের অনুশোচনা ও বেদনাবোধ এখানে অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ছন্দপ্রকরণের বিশেষ নিয়মানুসারে চরণ-শেষে মিল রাখা হয়েছে। এ মিল প্রথম ও তৃতীয় চরণে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে করা হয়েছে। ষটকে প্রথম এবং চতুর্থ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চরণে মিল রয়েছে। এরপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে অন্ত্যমিল রয়েছে। দুই অংশ মিলে একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ছন্দ-প্রকরণ ও শিল্পরূপ

'বঙ্গভাষা' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতিটি চরণে ১৪ মাত্রার দুটি পর্ব। প্রথম পর্ব ৮ মাত্রার ও দ্বিতীয় পর্ব ৬ মাত্রার।

শিল্পরূপ-সনেট (মৃদু ধ্বনি বা কম্পিত আওয়াজ)। সনেট ইতালীয় শব্দ। কবিতার একটি বিশেষ ধরনের রূপকল্প। একটি সনেটে ১৪ পঙ্ক্তি থাকে। ওই পঙ্ক্তিসমূহ ৮ পঙ্ক্তি ও ৬ পঙ্ক্তিতে বিভাজিত হয়–প্রথম ৮

পঙ্‌ক্তিকে বলে অষ্টক আর শেষ ৬ পঙ্‌ক্তিকে বলে ষটক। একটি সনেট একটিমাত্র ভাবের বাহন, তার মধ্যে অষ্টকে-ষটকে একটু পার্থক্য থাকে। অষ্টকে যে ভাব প্রকাশিত হয়, ষটকে তার সম্প্রসারণ থাকে। কিন্তু অষ্টক ও ষটক মিলিয়ে কবিতার একটি অখণ্ড মণ্ডল রচিত হয়। গঠনের দিক থেকে সনেট প্রধানত দুই রকম : পেত্রার্কীয় ও শেক্সপিয়রীয়। ‘বঙ্গভাষা’ সনেটটি রীতি বা মিলের দিক থেকে অনিয়মিত ধরনের। কবিতার চরণগুলোর অন্ত্যমিল এরকম: কখ কখ, খক খক, গঘ ঘগ, ঙঙ। কবিতার প্রথম চারটি চরণ ও শেষ দুটি চরণ শেক্সপিয়রীয় রীতিতে রচিত, পঞ্চম থেকে অষ্টম–এই চারটি চরণ অনিয়মিত শেক্সপিয়রীয় রীতি, নবম থেকে দ্বাদশ–এই চারটি চরণে পেত্রার্কীয় ঢং দেখা যায়।

এই কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের প্রভাব পড়েছে। ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করার অদম্য ইচ্ছা থেকে কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্য ক্যাপটিভ লেডি কাব্য হিসেবে সমাদৃত না হওয়ায় তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনা শুরু করেন এবং অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় এই দিকটাই অভিনব ভাবকল্পনায় বাণীরূপ পেয়েছে।

‘বঙ্গভাষা’ শুধু বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট নয়, এটি বাংলা সাহিত্যের সেরা সনেটগুলোরও অন্যতম। এর ভাববস্তু যেমন মার্জিত, পরিশীলিত ও সংহত, তেমনি শিল্পরূপ উঁচু মানের। ১৪ চরণের সীমিত-আঙ্গিক পরিসরে কবির অখণ্ড ভাবকল্পনা ক্রমবিকশিত হয়ে চমৎকার পরিণতি পেয়েছে। অষ্টকে বর্ণিত হয়েছে মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষাজনিত মনোবেদনা, ষটকে আছে স্বপ্ন-নির্দেশে সাহিত্য-সাধনার ধারার পরিবর্তনে সিদ্ধি অর্জনের পরিতৃপ্তি। এই সনেটে কবি শুধু তাঁর সুগভীর হৃদয়াবেগকেই প্রকাশ করেননি, সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে মাতৃভাষার মহিমা এবং ঐ ভাষার প্রতি কবির সুগভীর দরদ।

সামান্য ক্ষতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শতসখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা।
স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে
মহিষী কহিলা, "উহু শীতে মরি।
সকল শরীর উঠিছে শিহরি,
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী
শীত নিবারিব অনলে।"
সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য আননে–
"ওলো তোরা আয়, ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে,
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল"–
এত বলি রানী রঙ্গে বিভোল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।
কহিল মালতী সকরুণ অতি,
"একি পরিহাস রানীমা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি?
এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা।"
রানী কহে রোষে, "দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে!"
অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।
প্রভাত-পাখির আনন্দগান

ভয়ের বিলাপে টুটিল–
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তরবায়ু হইল প্রবল,
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল!
ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে,
দীপ্ত-অরুণ-বসনা।
তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া মিনতি।
সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা
রক্তিম মুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার–
কহিলা, "মহিষী, একি ব্যবহার!
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন রাজ্‌ধরমে!"
রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
"গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কতধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।"
কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে–
"যত দিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি–
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।"রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া–
অরুণবরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারি নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে তুলিয়া।
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে–

এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক'টি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পারো সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।
"বৎসরকাল দিলেম সময়
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।"

কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র বার বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছর বয়স পর্যন্ত অবিরল ধারায় কবিতা, গল্প, সংগীত, নাটক, উপন্যাস এবং অনবদ্য গদ্য রচনা করেছেন। কলাকৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ফলিয়েছেন সোনার ফসল, আর তাতে ভরে গেছে তাঁর সোনার তরী। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, আবেগের গভীরতা ও রোমান্টিকতার অভিসার, ইন্দ্রিয়জগতের সাথে ইন্দ্রিয়াতীতের মিলন, সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের মিলনক্রীড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত একালে অন্য কোনো একক কবির মধ্যে দেখা যায়নি। বিশ্বসাহিত্যের অন্য কোনো কবিপ্রতিভার সঙ্গেও তাঁর তুলনা হয় না। গ্যেটে, হোমার, দান্তে, রবীন্দ্রনাথ–এঁরা কেউ কারো সঙ্গে তুলনীয় নন। শুধু সৃষ্টিশীলতার বহুমুখিতার প্রশ্নে গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের তুলনা চলে। গ্যেটেও মূখ্যত সাহিত্যিক এবং তাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মতোই বিচিত্রমুখী–গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত; জার্মান সাহিত্যের এমন কোনো বিভাগ বা শাখাপ্রশাখা নেই, যার ওপর তাঁর প্রতিভা আপন স্বাক্ষর রাখেনি। রবীন্দ্রনাথের বিশাল শিল্পভুবনকে ১. কাব্য-কবিতা, ২.নাটক, কাব্যনাটক ও নাট্যকাব্য, ৩. উপন্যাস ও ছোটগল্প, ৪.প্রবন্ধনিবন্ধ শীর্ষক ধারায় শ্রেণিকরণ করা যায়। তবে সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি। কাব্যপ্রতিভার এমন সর্বত্রসঞ্চারী কবি বিশ্বে বিরল।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই বাংলা কবিতা বিশ্বসাহিত্যে নতুন পরিচয়ে স্থান করে নেয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গীতাঞ্জলি গ্রন্থের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্যকীর্তির মধ্যে রয়েছে সোনার তরী, চিত্রা, কথা-কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, পুনশ্চ, শ্যামলী প্রভৃতি। তিনি শুধু একজন সার্থক কবি বা লেখকই নন; একাধারে সুরকার, চিত্রকর, নাট্যাভিনেতা, নাট্য প্রযোজক, শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদ ও দার্শনিক। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ বা ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মূলভাব

'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সমাজ-সচেতনতা, মানবিকতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট কবিতা। এখানে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। রাজমহিষী মুহূর্তের সুখের জন্য অহংবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে গরিব প্রজার গৃহে আগুন ধরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। গরিব প্রজা দলে দলে এসে রাজার নিকট নালিশ করার পরেও রানীর কোনো অনুশোচনা জাগেনি। বরং রানী উদ্ধতভাবে রাজাকে বলেছেন কী এমন ক্ষতি হয়েছে, এক মুহূর্তের প্রমোদে রাজমহিষীর কত ধন যায়। মানুষের সুখ-

দুঃখের আশ্রয়কে তিনি খড়কুটোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু দুর্বিনীত আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে রাজা রানীকে চরম শাস্তি দিয়েছেন। ভিখারি নারীর চীরবাস তিনি রানীর দেহে পরিয়ে দিয়ে এক বছর বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতে বলেছেন। যতদিন রানী ভস্মীভূত কুটির গড়ে দিতে না পারেন ততদিন রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রবেশাধিকার দেননি। রাজা এখানে নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। রানীর নিকট যা সামান্য ক্ষতি বলে মনে হয়েছে, রাজার নিকট তা নিষ্ঠুরতা। তাই অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি রানীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন। রাজার কাছে রানী এবং গরিব প্রজার মধ্যে কোনো বিভেদ দেখানো হয়নি। রানীর জীবন বিলাসে কাটে বলে তিনি গরিবের দুঃখ বোঝেন না। রাজা তাঁকে গরিবের মতো দিন অতিবাহিত করতে বাধ্য করে গরিবের দুঃখ বোঝাতে চেয়েছেন। নিছক আত্মতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করার মনোবৃত্তি এখানে নিন্দিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এখানে মানবধর্ম ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কাণ্ডারী হুশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।

এ তুফান ভারী, দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরী পার।।
তিমিররাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে যে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিব ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

কবি পরিচিতি

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে নন্দিত আসন পেয়েছেন। বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। লিখেছেন কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাদি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই অভিনব। তাঁর কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর লেখা গান 'চল্ চল্ চল্ চল্' আমাদের রণসংগীত।

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা ও প্রেমসত্তার মিলনমধুর প্রকাশ আমরা লক্ষ করি তাঁর প্রেমের কবিতা ও বিদ্রোহের কবিতায়। তিনি *দোলনচাঁপা*, *ছায়ানট*, *চক্রবাক*, *সিন্ধুহিন্দোল* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রেমভাবে যেমন কম্পমান, তেমনি আবার *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশী* ও অন্যান্য বিদ্রোহাত্মক কবিতায় দুর্বিনীত ও উন্নত শির। প্রেম ও বিদ্রোহ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমী, সাম্যবাদী এবং আন্তরিক।ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে ঝিঙে ফুল, সঞ্চয়ন, পিলে পটকা, ঘুম জাগানো পাখি, ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি এবং নাটক পুতুলের বিয়ে। কবিকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে রবীন্দ্রভারতী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কবিকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং 'জাতীয় কবি'র মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের *সর্বহারা* কাব্যের অন্তর্গত একটি কবিতা, যদিও গান হিসেবেই এটি অধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। নিপীড়িত গণচিত্তের প্রতি কবি নজরুলের সহানুভূতি অনিঃশেষ। বিদেশি শাসনামলে পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের গ্লানি এবং দুর্দশা কবিকে ব্যথিত করেছে সবসময়। এই গ্লানিবোধ থেকে কবি একদিকে যেমন হয়েছেন বিদ্রোহী, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দুর্দশায় হয়েছেন ব্যথিত। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতার প্রতিটি চরণেই কবি নিপীড়িত এই সাধারণ মানুষকে মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত হবার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছেন। তাই বলা যেতে পারে কবিতাটির মূল সুর জাগরণমূলক। বিভিন্ন অনুষঙ্গ যেমন দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, কিংবা দুস্তর পারাবার ইত্যাদির অবতারণা করে তিনি কান্ডারীকে সাবধান করে দেন যেন এই প্রতিকূলতায় তিনি বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক মনোবল নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেন।

আমরা জানি প্রেম ও বিদ্রোহ আপাত-বিপরীত হলেও নজরুল-মানসের ভিত্তি এই দুই সত্তা। মেরুদণ্ডহীন জাতির প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য নজরুল তাঁর কবিতায় বারবার বিদ্রোহী হয়েছেন। লজ্জা, দ্বিধা এবং ভয় বিসর্জন দিয়ে উঠে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ উদাত্ত কণ্ঠে। এই কবিতায়ও আমরা কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের এই সুর প্রত্যক্ষ করি। কবিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল মৃতপ্রায় প্রাণহীন বাঙালি জাতিকে তন্দ্রাহত জগৎ থেকে উদ্ধার করে নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এবং অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতায় আমরা তাঁর মানবপ্রেমের আবেগও লক্ষ্য করি। মানবপ্রেমিক ছিলেন বলেই যুগযুগান্ত ধরে চলমান অত্যাচার কবিচিত্তকে বারবার আলোড়িত করেছে। বেদনাহত কবি দুঃখ-বেদনার হাত থেকে মানুষের মুক্তি কামনা করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান এই কবিতায়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, যা নজরুলের কবিতায় মানবপ্রেমের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতায় লক্ষণীয়। তাই পরিশেষে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের স্বাদেশিকতা, বিদ্রোহ, মানবপ্রীতি ইত্যাদি সমস্ত মনোভাবের অকৃত্রিম প্রকাশের এক অনবদ্য কাব্যরূপ 'কান্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি।

প্রতিদান

জসীম উদ্‌দীন

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী–
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি।
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
যে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,–
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী, আমি লয়ে সখি, তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

কবি পরিচিতি

জসীম উদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর রচিত 'কবর' কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রাখালী, হাসু, এক পয়সার বাঁশী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তার নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও দেশে-বিদেশে অভিনীত হয়েছে। শিশুদের জন্য লেখা 'ডালিমকুমার' তাঁর অনবদ্য রচনা। এ ছাড়া তিনি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি, নাটক ও প্রবন্ধও রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে পল্লীর মানুষের জীবন-কাহিনি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে বলে তাঁকে 'পল্লীকবি' আখ্যায়িত করা হয়। অসাধারণ কবিকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে সম্মানিত করে। ১৯৭৬ সালে কবি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

'প্রতিদান' কবিতায় কবি উদার মানবিকতার প্রীতিময় বাণীকে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করেছেন। কবি উপলব্ধি করেন, অসাধারণ প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে সব মানুষের হৃদয় জয় করতে পারাই সত্যিকার মনুষ্যত্ব। যে কেউ তাঁর প্রতি শত্রুতা করতে প্রয়াসী হোক না কেন, প্রতিদানে তিনি দেবেন মমতা ও ভালোবাসা। কেউ যদি কবির ঘর ভেঙে দেয়, তাঁকে ঘরছাড়া করে, তবে প্রতিদানে তিনি তার ঘর বাঁধার কাজে ব্রতী হবেন। তাকে আপন করে পাওয়ার জন্য পথে পথে ঘুরবেন। কেউ যদি তাঁর ক্ষতি করে, নিষ্ঠুর আচরণ করে কিংবা কঠিন আঘাতে অন্তরকে জর্জরিত করে, কবি তাতে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ন হবেন না। প্রতিদানে তিনি দেবেন বুকভরা মমতা। কাঁটার বদলে দেবেন ফুলের মালা। যে যতই বিমুখ হোক, তাঁর প্রাণে যতই আঘাত দিক না কেন, তিনি নির্দ্বিধায় তা সহ্য করবেন। সকল শত্রুতা, হিংসা-দ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে তিনি জয় করবেন প্রেম, প্রীতি, মমতা ও ভালোবাসার জোরে। 'প্রতিদান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবেন, অসাধারণ প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়েই কেবল মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। ফলে তাঁরা হিংসার পথ পরিহার করে প্রেম, প্রীতি ও মমতার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করবেন।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্য
আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত-গঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েল্‌লেস রাইফেল
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের ওপর।
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুত্থুরে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন–তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্ণের

দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দগ্ধ ঘরের।
স্বাধীনতা–তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
ব'সে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে-জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে–
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

কবি পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ঢাকায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত হয়েছে। কবিতার উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি প্রকৃতির উপর যেমন নির্ভরশীল ছিলেন, তেমনি তাঁর কবিতার বিষয় ও উপাদান মূলত শহরকেন্দ্রিক। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক

কাঁটা, এক ধরনের অহংকার, আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি, আমি অনাহারী, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, গৃহযুদ্ধের আগে ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর কিছু অনুবাদ কবিতা ও শিশুতোষ কবিতা রয়েছে। তিনি ২০০৬ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য আর কত মূল্য দিতে হবে–এই কবিতায় কবি এই সত্য প্রশ্নের আকারে বিধৃত করেছেন। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক রক্ত দিয়েছে। অনেক মা-বোন চিরতরে তাঁদের আপনজন হারিয়েছেন। পাকিস্তানি জল্লাদদের নির্মম অত্যাচারে, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজে তছনছ হয়ে গেছে এই জনপদ। তাদের ঐ নারকীয় তাণ্ডব থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভিটেমাটি ছেড়েছে কোটি কোটি নিঃসম্বল মানুষ। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অবুঝ শিশু তার মাকে হারিয়েছে। ভৌগোলিক স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছে যে বাঙালি, তারা যেন এবার সত্যিকার সেই স্বাধীনতা পায়, এটাই কবির আকাঙ্ক্ষা। তিনি এ ব্যাপারে আশাবাদী– সত্যিকারের স্বাধীনতা আমাদের আসবেই। তার জন্য আমাদের চাই নতুন চেতনা, চাই নতুন আত্ম-উপলব্ধি, চাই নতুন অঙ্গীকার। তাহলেই স্বাধীনতার তরুশাখা ফুলে-ফলে ভরে উঠবে বলে কবির বিশ্বাস।

অধ্যায় ৬

ছোটগল্প

মানুষের গল্প বলা ও শোনার আগ্রহ বহু প্রাচীন। ধ্বনি বা অক্ষরভিত্তিক ভাষা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ গুহাগাত্রে বা গাছের বাকলে বিভিন্ন চিত্র এঁকে মূলত অন্যের কাছে তার গল্পটি বলতে চেয়েছে সেহোক বাইসন শিকারের বা জাদু বিশ্বাসের। প্রাচীন মিথ বা পুরাণ কাহিনি মূলত গল্পেরই বিভিন্ন রকমফের। ইলিয়াড-ওডিসি বা রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাহিনিগুলো গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট ছোট উপকাহিনি দিয়ে। এই ছোট ছোট উপকাহিনির মধ্যেই হয়তো ভবিষ্যতের স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটগল্পের বীজ লুকিয়ে ছিল। অনেকে বৌদ্ধ জাতকে, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশে কিংবা ঈশপের গল্পে ছোটগল্পের আকর খুঁজে পেয়েছেন। তবে বর্তমানে ছোটগল্প বলতে যা বুঝি, তা সাহিত্য-শিল্পরূপের আধুনিক একটা অবয়ব। বর্তমান সময়ের ব্যস্ত ও জটিল জীবনযাপন ও জীবনজিজ্ঞাসার বাস্তবতায় ছোটগল্পের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে উপন্যাস ও বড় আকারের গল্পের তুলনায় আধুনিক ব্যস্ত মানুষের কাছে ছোটগল্প প্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রাণোচ্ছল শাখা হচ্ছে ছোটগল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত (Impression) একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনি যার অন্যতম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা পরিবেশ কিংবা মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" ছোটগল্পের আকৃতিগত বিবেচনা মুখ্য নয়; বরং প্রকৃতিগত ও মর্মগত দিক বিচার করেই ছোটগল্পকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করা হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতার অংশবিশেষ ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়–

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা

নিতান্তই সহজ সরল

সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ–

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

ছোটগল্প লেখকের আত্মসচেতন সৃষ্টি। 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'–এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে ছোটগল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। এছাড়া ছোটগল্পে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়–

ব্যঞ্জনাধর্মিতা : সাধারণত কবিতার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার ব্যাপারটি লক্ষণীয় হলেও ছোটগল্পেও এর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বর্ণনাভঙ্গির স্বতন্ত্র প্রয়োগের জন্যই কখনও কখনও ছোটগল্পের শব্দগুচ্ছ বা বাক্য তার অর্থকে ছাড়িয়ে গভীর ভাবব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

সুসংবদ্ধতা : ছোটগল্পের ভাষা, চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস হয়ে থাকে সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো ঘটনা ও চরিত্রের স্থান ছোটগল্পে একেবারেই থাকে না।

সংবেদনশীলতা : ছোটগল্প জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ। এতে লেখকের সংবেদনশীল মানসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে থাকে।

জীবনের খণ্ড অংশ : ছোটগল্পের ক্যানভাসে মূর্ত হয় বৃহৎ জীবনপ্রবাহের একটি খণ্ডিত রসঘন মুহূর্ত। আর এ মুহূর্তটির বহমানতা হয়ে থাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন।

চরম মুহূর্ত : নাটকের তৃতীয় অঙ্কে যেমন ঘটনার চরম উৎকর্ষ বা ক্লাইমেক্স রূপ পায়, ছোটগল্পেও তেমনি একটি চরম মুহূর্ত লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ে পাঠকের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে পড়ে পরবর্তী পরিণতি জানার প্রত্যাশায়।

আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি : এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হয় গল্পের শেষ পরিণতিতে। দৃশ্যত গল্পটি শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের মনে একটি অতৃপ্তিবোধ থেকেই যায়। এরপর কী হলো, কী হতে পারে–এ বিষয়ে পাঠক ভাবতে শুরু করে। বস্তুত এটিই ছোটগল্পের সার্থক পরিণতি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগ

জীবনের বিচিত্র খণ্ডচিত্র নিয়ে ছোটগল্পের ভূবন আবর্তিত বলে ছোটগল্প স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যে বিন্যস্ত। এ কারণে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিকরণে ছোটগল্পকে ধরা দুরূহ। তবু বিভিন্ন আলোচক ও সমালোচক নিম্নোক্তভাবে ছোটগল্পকে শ্রেণিকরণ করেছেন–

১. রোমান্টিক প্রণয়ের গল্প, ২.সমাজসমস্যা ও সমাজসংকটধর্মী গল্প, ৩. দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক গল্প, ৪. প্রকৃতি ও মানবজীবনসংক্রান্ত গল্প, ৫. রূপক বা সাংকেতিক গল্প, ৬. পরাবাস্তব বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ক গল্প, ৭. জাদুবাস্তবতাধর্মী গল্প, ৮. ব্যঙ্গরস বা হাস্যরসাত্মক গল্প, ৯. ঐতিহাসিক বা কল্পবৈজ্ঞানিক গল্প, ১০. রহস্য বা গোয়েন্দা গল্প ইত্যাদি।

বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে। বাংলা গদ্যের বিকাশের সাথে যেহেতু বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কিত, সেহেতু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব হয় বিলম্বে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছোট আকৃতির গল্প লিখলেও তাকে ছোটগল্প বলা হয়নি। কারণ আকৃতিতে ছোট হলেই তাকে

ছোটগল্প বলা যায় না, ছোটগল্পের প্রকৃতিও ভিন্ন। প্রকৃতির দিক থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীই (১৮৫৫-১৯৩২) প্রথম সচেতনভাবে বাংলা ছোটগল্প রচনা করেন। রসপ্রকৃতির দিক থেকে তাঁকে সাথর্ক স্রষ্টা বলা যায় না, সেক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) অনেকাংশে সাথর্ক । বস্তুত প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) কিছুটা স্বতন্ত্রের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। তবে এ সত্য অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা ছোটগল্পের সাথর্কতম রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, বিষয় বৈচিত্র্যে, ভাবসম্পদে ও আঙ্গিক নির্মাণে তিনি বিশ্বমাপের ছোটগল্পকার রূপে নন্দিত হন। রবীন্দ্রনাথসুরী গল্পকারদের হাতে অনেক গল্প রচিত হলেও ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন মননে রচিত হয়েছে তিরিশোত্তর গল্পকারদের গল্পগুলো। সগুভীর জীবনদশর্ন ও জীবনাদশের্র প্রতিভাসিদ্ধ স্পর্শে তাঁদের গল্পগুলো উজ্জ্বল। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অচিন্ত্য কমুার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বদ্ধুদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৯৯-১৯৭৬), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), পদ্ম থনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বনফলু বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৬), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), অনদ্নাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), সৈয়দ মজুতবা আলী (১৯০৫১৯৭৩) প্রমূখ বাংলা ছোটগল্পের মান ও পরিধি ঋদ্ধ করেছেন। এ ধারার পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের ছোটগল্পও নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতিতে ক্রমশ বিকাশমান।

তোতা-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা-কানুন কাকে বলে। রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার। পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, 'উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী?' সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।' স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে। পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তাহারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'শাবাশ! বিদ্যা আর ধরে না!'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাহাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তাহারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তন্‌খা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তাহারা এবং তাহাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তাহারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কি কথা শুনি!' ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের; ডাকুন যাহারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারক-নবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য! শব্দ কম নয়!'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই - চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকাল বেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'একি বেয়াদবি!'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা। রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাহাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাহাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।' ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কি কথা শুনি!' ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।' রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়?' ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি উড়ে?'
'না।'
'আর কি গান গায়?'
'না।'
'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?' 'না।' রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।' পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল। বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে সাহিত্য এবং ধর্ম ও দর্শন চর্চার চল ছিল। রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার কোনো ডিগ্রি তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন সকল অর্থেই এক বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব্যক্তি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র তাঁর প্রতিভার ছোঁয়ায় বিকশিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পৌঁছে দেন। নিতান্ত শৈশবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বনফুল* প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, বলাকা ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা ইত্যাদি।

ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে গল্পগুচ্ছ। এছাড়া নাটক, প্রবন্ধ, চিত্রকলা–সবকিছু মিলিয়ে তাঁর রয়েছে বিশাল সৃষ্টিসম্ভার। তিনি ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই মহান স্রষ্টা ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) দেহান্তরিত হন।

মূলভাব

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার এক নিদারুণ করুণ চিত্র ফুটে ওঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'তোতা-কাহিনী' গল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শিক্ষায় প্রবেশ করেছিলেন, ততদিনে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন শেখানোয় ঔপনিবেশিক কাঠামো পুরো জেঁকে বসেছিল। এ ব্যবস্থার সৃজনশীলতাহীনতা ও মুখস্থনির্ভরতা শিশু রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে তিনি এ ব্যবস্থা থেকে পালিয়ে বেঁচে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক হয়ে ওঠেন। 'তোতা-কাহিনী' অনেকটা এরই প্রতিক্রিয়ায় লেখা। এ গল্পের ভেতর দিয়ে তিনি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায়, প্রাণহীন মুখস্থনির্ভর, পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছেন। এ গল্পে আমরা একটি প্রাণচঞ্চল, সংগীতপ্রিয় পাখিকে শিক্ষা দেবার নামে খাঁচায় বন্দি করে পুঁথির শুষ্ক পৃষ্ঠা গিলিয়ে হত্যার চিত্র দেখতে পাই। এর মাধ্যমে মূলত স্কুল নামক চারদেয়ালে বন্দি শিশুদের মুখস্থবিদ্যা শেখানোর মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও সৃজনশীলতাকে হত্যার চিত্রই ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি রাজ-দরবারের অপচয়, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কৌতুককর চিত্রও এ গল্পে প্রতীকায়িত হয়েছে।

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুজ্জে উঠানে পা দিয়েই স্ত্রীকে বলিলেন-একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাঠি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাঠিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেন না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না। সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন-কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটি? আঃ, ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন-তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল-ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন-কেন...কি আবার...কি...

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন-দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি-ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, নাকি কিছু খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–কেন? কি গুজব?

–কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগদী-দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।-সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন–একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না-ও নাকি উচ্ছুগগু করা মেয়ে-গাঁয়ের কোনো কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না-যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ি বাগদী-বাড়ি উঠে-বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন-এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর!-ওঃ!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন-কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই, চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায়

একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?-আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ি মেয়ে হয়ে উঠল।...হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন-হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?...পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন-না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কিদুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন-কিন্তু খিড়কি-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন-এসব কি রে! ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে...

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো-বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরচ সরচ কাচের চুড়িগুলো দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল-চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ির কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে-তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুন দুটো পয়সা বাকি আছে; আমি বললাম-দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে-আর এই পুঁইশাকগুলো...ঘাটের ধারে রায় কাকা দিয়ে বললে, নিয়ে যা-কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন-নিয়ে যা! আহা, কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দুদিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন-ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হলো না...যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ির বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন; আর একজন বেড়াচ্ছেন-কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ...ফেল বলছি ওসব...ফেল্।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন-যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো...ফের যদি বাড়ির বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং খোঁড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।...সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা-আমতা করিয়া বলিতে গেলেন-তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে...তুমি আবার... বরং...

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন-না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না-মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের! একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে! যা, যা...তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়...

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দুটো জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না-নিঃশব্দে খিড়কিদোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িলগত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল-মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের।

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কিদোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন-বাকিগুা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাইগাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপি চুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুর বেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন–কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন-সে সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো, কেষ্ট মুখুজ্জে...স্বভাব নইলে পাত্র দেব না, স্বভাব নইলে পাত্র দেব না করে কি কাণ্ডটাই করলে-অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষে। তারা কি স্বভাব? রাম বলো, ছয়,সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন-তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশিদূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন-এই শ্রাবণে তেরোয়...

-আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগুগু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো?...সমাজে বসে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল...পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে

না? গরিব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে। জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন-ধানও করেছে, ব্যসরাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা-ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি-শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোনো ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হক পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকারবধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবুর গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল-বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল–

সহায়হরি একবার বাড়ির পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেনযা শিগগির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি! কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতোমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল-তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল-ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন-মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকি দুর্গা আসিয়া বলিল-খুড়িমা, মা বলে দিলে খুড়িমাকে গিয়ে বল, মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুজ্জে বাড়ি ও-পাড়ায়-যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হল্‌দে পাখি আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল-খুড়িমা, খুড়িমা, ঐ যে কেমন পাখিটা।–পাখি দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল...কে যেন কি খুঁড়িতেছে...দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া

উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন-এখনো নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল–এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব। ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন-ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে-কর্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন-আমি। না...আমি কখন?...কক্ষনো না, এই তো আমি। ...সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতোই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না। আমি সব জানি...মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ...তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরচদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনো পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধা ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ি ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন-ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল-সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ির সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন-কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কিনা?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল-হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন-পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে! সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্‌কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে আমি কি করব, মা?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল-মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবদ্ধনে হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্ধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বললেন-দূর পাগলি, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে!

ক্ষেন্তি বলিল-কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন-দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে! আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।...একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্জে বাড়ি হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বললেন-হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত!

-আচ্ছা দিচ্ছি বাবা-কই শীত, তেমন তো...

-হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে-অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে, বুঝলি নে?-সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনো রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না-ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন...একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নিচে একটা কলার পাতা পাতিয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে,

বনেবাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল-মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজ মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মার সামনে পাতিয়া বলিল-মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন-দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি...। ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজ মেয়ে পুঁটি বলিল-জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরি করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল-এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এইসব হয়েছে। পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল-হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়েই করে, সে তো কেমন লাগে।

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল-খেঁদীর ওই সব কথা। খেঁদীর মা তো ভারি পিঠে করে কিনা! ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ি দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়িমা দুখানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ...আর মার পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপ্‌টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকেল কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন-নে, কিন্তু এখানে বসে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারিকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন-ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দেই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল–মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধী খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনো খাইতেছে। সে মুখ বুঁজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন-ক্ষেন্তি, আর নিবি?... ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল-বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নাও, ওতেই কিন্তু...। সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলি তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁহার এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন-ক্ষেন্তি আমার–যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি, সিলেটে চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে–এ রকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন-চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না। বাড়ির বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং–এবার মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁহার বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল-মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও, দুটো মাস তো-।

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন-তোর বাবা তোর বাড়ি যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক-তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমি সুরে বলিল-না, যাবে না বৈকি!...

দেখ তো কেমন না যান! ফাল্গুন চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হুহু করিত...

তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়িতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতো হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে-মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন-ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভালো কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়া ছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন-নাঃ সব তো আর...তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।...তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছয়টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন-বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

–একেবারে চামার....

–তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে... ছোটলোকের মেয়ের মতো চাল, হাভাতে ঘরের মতো খাই...

আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম–মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কয়েক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন-তারপর?

–আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে...। পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন–বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুজ্জের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে–আজই না হয় আমি...প্রাচীন আভিজাত্যের

গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন। বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

–তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার–বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল–তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

–দেখতে পাওনি? নাঃ! এমনি চামার–গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।... যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।... চার কি ঠিক করলো?... পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই। সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরচ্চাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারি করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে। রাধী বলিতেছে–আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন?

পুঁটি বলিল–আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

–ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এক্ষুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন–সরে বোস মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারি হইয়া গেল...খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠ টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।...পুঁটি বলিল -মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন–একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ির পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে!...

পুঁটি ও রাধী খিড়কিদোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস খস শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হাঁটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন–দিলি?

পুঁটি বলিল–হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম... তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশি।... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ্ঠোকরা পাখি ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল–দিদি বড় ভালোবাসত ...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল...সেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া

উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

লেখক পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম মৃণালিনী দেবী। তাঁর পিতা ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য ও কথকতার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেছিলেন। পারিবারিক এই পরিমণ্ডলে পিতার কাছেই বিভূতিভূষণের পড়ালেখার সূচনা। এরপর নিজ গ্রামের পাঠশালা শেষে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে তিনি প্রথম শ্রেণিতে মাধ্যমিক ও ১৯১৬ সালে রিপন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯১৮ সালে একই কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।

তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর পেশাজীবন শুরু করেন। মাঝখানে কিছুদিন এক জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার পদে কাজ করলেও বাকি জীবন শিক্ষকতা করেই কাটান।

১৯২১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'উপেক্ষিতা' শীর্ষক ছোটগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যজগতে প্রবেশ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিতা (১৯৩২), দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫), কিন্নরদল (১৯৩৮), আরণ্যক (১৯৩৯) ইত্যাদি। তিনি ১৯৫০ সালের মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'পুঁই মাচা' একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। বিভূতিভূষণের রচনা প্রকৃতিচেতনা, সমাজবাস্তবতা ও দারিদ্র্যের নিখুঁত বর্ণনার জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। 'পুঁই মাচা' ছোটগল্পটি এর ব্যতিক্রম নয়। এ গল্প সহায়হরির সহায়হীন হতদরিদ্র পরিবারের করুণ কাহিনি। দারিদ্র্য ও মৃত্যুর সাথে লড়াই এবং হতদরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম গ্রামবাংলার প্রেক্ষাপটে পাঠকের মনকে মর্মস্পর্শী বেদনায় অশ্রুসিক্ত করে। পুঁই মাচার নিখুঁত বয়ানে ক্ষেন্তি জীবনের নশ্বরতা ও সহায়হরি পরিবারের শূন্যতা এ গল্পের সারবস্তু। দারিদ্র্যের কারণে নিদারুণ অবহেলায় ক্ষেন্তির মৃত্যু এবং তার লাগানো পুঁইডাঁটার প্রতীকের ভেতর দিয়ে তার পরিবারে প্রত্যাবর্তন এ গল্পের করুণ উপজীব্য বিষয়।

নিমগাছ

বনফুল

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই... কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে। যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার। কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...দাঁত ভাল থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

বলেন–''নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।"

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না। আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে। শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় কেউ–সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলে শুধু।

বলে উঠল, বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি...কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কী বাহার..."একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে, বাঃ–"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল। কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটির ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

লেখক পরিচিতি

লেখক বনফুলের আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। 'বনফুল' তাঁর ছদ্মনাম। তিনি ১৮৯৯ সালে ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলায় মণিহারিতে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি ছিলেন ডাক্তার। পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২৭ সালে ডাক্তারি পাস করে ভাগলপুরে চল্লিশ বছর ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। ছাত্রজীবনেই নামি-দামি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সাহেবগঞ্জ হাই স্কুলে পড়ার সময় তাঁর প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস তৃণখণ্ড তাঁর ডাক্তারি জীবনের শুরুতেই প্রকাশিত হয়। ছাত্রজীবনে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী ও পেশাজীবনে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন বাংলা ব্যঙ্গরচনার গুরচ ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে। এই বনবিহারীকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে অগ্নীশ্বর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রাণী-প্রকৃতি ও মানুষের স্বভাব বিষয়ে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। পক্ষিজগৎ নিয়ে তিন খণ্ডে রচিত ডানা উপন্যাস তার প্রমাণ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে–স্থাবর, জঙ্গম, মন্ত্রমুগ্ধ, হাটেবাজারে, কিছুক্ষণ, বিন্দু

বিসর্গ, দ্বৈরথ, শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি। 'পশ্চাৎপট' তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা। তাঁর এ রচনাগুলোতে যেমন গভীর বোধের তেমনি শিল্প-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাংলা অনুগল্পেরও (আকারে ক্ষুদ্র) জনক। সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর 'নিমগাছ' একটি বিখ্যাত গল্প। বাংলা ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পের এটি একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু আকৃতির দিক থেকে নয়, প্রকৃতিগত দিক থেকেও গল্পটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশক ও শিল্পরূপমণ্ডিত। গল্পটিতে একটি নিমগাছের উপকারী ভূমিকার কথা আপাতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিমগাছ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কত রকমেই না কাজে আসে। মানুষ নির্মমভাবে নিমগাছের উপকারী গুণসমূহ কাজে লাগায়। কিন্তু নিমগাছের একটও যত্ন নেয় না। সে অদূরে নোংরা আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। কবিরাজ তার গুণের কদর কাজে লাগায় কিন্তু রূপের কদর করে না, যেটা করেন কবি। নিমগাছের ইচ্ছে হয় কবির সাথে চলে যায়, কিন্তু সে পারে না। কেননা সে শেকড়ে বাঁধা। তারপর লেখক বলেন, ও বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা। পাঠকরা তখন বুঝতে পারেন লেখক আসলে এতক্ষণ নিমগাছের রূপকে একজন বাঙালি গৃহবধূর দুর্দশার চিত্রই অঙ্কন করেছেন। একজন গৃহকর্ম-নিপুণা গৃহবধূ পরিবারের সকলের কত কাজেই না আসেন, কিন্তু বিনিময়ে তিনি কোনো মূল্য পান না। বদ্ধ জীবনের প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত বউটি ভালোবাসা ও মুক্তি কামনা করে, কিন্তু সংসারের দায়িত্বশীলতার নিগড়ে সে এমনই বাঁধা যে তার ব্যক্তিমনের মুক্তি মেলে না। উপকারী নিমগাছটিকে যেমন আবর্জনার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, ঠিক তেমনি পরিবারের সকল সুখের কাণ্ডারি একজন গৃহবধূর স্থান হয় তেলকালিঝুলি ও উচ্ছিষ্টভরা রান্নাঘরে।

অধ্যায় ৭

প্রবন্ধ

প্রবন্ধের স্বরূপ

'প্রবন্ধ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় প্র+বন্ধ বা প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন অনুসরণ করে গদ্যরীতিতে রচিত মননশীল রচনাকে প্রবন্ধ বলে অভিহিত করা যায়। প্রতিটি প্রবন্ধ সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক। যথেষ্ট প্রমাণ, উপযুক্ত তথ্য-তত্ত্ব প্রয়োগ করে ভাষার চিন্তায় সেই বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করাই হলো প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীশচন্দ্র দাশ প্রবন্ধের সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে–"কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতনতামূলক নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা সাধারণত গদ্যে এবং নাতিদীর্ঘ করিয়া লিখিতে হইবে।" অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধকে ব্যাখ্যা করেন 'চিন্তামূলক তথ্যবহুল গদ্যরচনা' হিসেবে।

প্রবন্ধের বৈচিত্র্য

প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়–(১) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ ও (২) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

১) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ: বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য। ইংরেজিতে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে Impersonal Prose, Formal Essay, Discourse ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে পাঠশেষে বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাঠক কোনো বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বিকাশের সুযোগ পায়। শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে, 'বস্তুনিষ্ঠ' প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। অন্যদিকে মন্ময় বা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যরসমণ্ডিত বা কোমলতা দান করে উপস্থাপন করা হয়। যুক্তি, উপাত্ত, প্রমাণ দ্বারা কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠাই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের লক্ষ্য। অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের বাইরে লেখকের নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে নেই। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

– তত্ত্ব, তথ্য ও বস্তুভার
– বিষয় গৌরবের প্রাধান্য
– যুক্তিতর্ক সংবলিত
– প্রমাণ নির্ভর
– তত্ত্বকথা বা সমস্যার আলোচনার প্রাধান্য।

২) ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ: ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে Essay Literature, Personal Essay, Informal Essay ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যক্তি হৃদয়ের প্রাধান্য ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যুক্তি, তর্ক, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণাদি ইত্যাদির তুলনায় ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে ব্যক্তি হৃদয়ের যুক্তি ও আবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পায়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ (Form), অর্থাৎ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির সমতুল্য। ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠশেষে পাঠক লেখকের উপস্থাপিত বিষয়ের আবেগ, সৌন্দর্য ইত্যাদির সাথে একাত্ম বোধ করেন এবং সৃষ্ট সৌন্দর্যের রস-আস্বাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের বাঁধুনির চেয়ে একটি

মনের বিশেষ মুহূর্তের মুড বা মেজাজ অধিকতর উপভোগ্য হয়। জীবনচরিত, আত্মচরিত, পত্রসাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদি ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।"

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা

বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যকে তিনটি পর্যায়ে বিভাজিত করে আলোচনা করা যেতে পারে : উন্মেষ পর্ব, বিকাশ পর্ব ও বাংলাদেশ পর্ব।

উন্মেষ পর্ব: উনিশ শতকের শুরুতে গদ্যের সূত্রপাতের সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা সম্পর্কিত। এ সময় বিদ্বৎমহল সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে চর্চা শুরু করেন। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য মূলত ঐ চিন্তন প্রক্রিয়ার লিখিত রূপের ফল। বিশেষত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতে প্রবন্ধের গোড়াপত্তন ঘটে। তবে এ সময়ের রচনায় প্রবন্ধের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে অনুপস্থিত এবং প্রধানত দেশি-বিদেশি উপকথার অনুবাদ, ঐতিহাসিক কাহিনি, পাঠ্যপুস্তক, ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায়ের উপযুক্ত ভাষাশৈলী ও যুক্তিনিষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে প্রবন্ধ-সাহিত্যের শৈল্পিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সমকালীন সাময়িকপত্রসমূহে সমাজ ও ধর্মবিষয়ক বিচিত্র বিষয়ের অবতারণাও প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। পরবতীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ প্রবন্ধ-সাহিত্যের উন্মেষে বিশেষ অবদান রাখেন।

বিকাশ পর্ব: প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর বিষয়-বৈচিত্র্য। বিকাশ পর্বে অসংখ্য সৃজনশীল প্রাবন্ধিকের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ এ ধারায় উৎকর্ষ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ পর্বের অন্যান্য প্রাবন্ধিকের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, শিবনাথ শাস্ত্রী, মীর মশাররফ হোসেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে রচিত অধিকাংশ প্রবন্ধই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। পরবর্তীকালে সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতোই প্রবন্ধ-সাহিত্যও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীস্পর্শে শৈল্পিকতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ উভয় ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজনকুশলী সাহিত্যপ্রতিভার লক্ষণ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-সমসাময়িক অন্যান্য প্রাবন্ধিক, যেমন–রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট প্রবন্ধধারার শৈল্পিকতাকে বেগবান করেছেন।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ: ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বর্তমান বাংলাদেশের পরিসীমায় রচিত প্রবন্ধ-সাহিত্য বিষয় ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম সমাজের জন্য পথ নির্দেশের প্রয়োজনে বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্য এই ভিন্ন মাত্রিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সঙ্গত কারণেই ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয়। বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে দুই পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে : মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী এব মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আব্দুল ওদুদ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলেখ্লযোগ্য।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ, বাঙালি জাতীয়তাবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় জাগরণ ইত্যাদি বিষয় চর্চার মাধ্যমে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত নির্মাণ এই সময়ের প্রাবন্ধিকদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী যুগে আবদুল হক, ড. আহমদ শরীফ, ড. আনিসুজ্জামান, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. আবদুল্লাহ আলমুতী প্রমুখ প্রাবন্ধিক নবগঠিত রাষ্ট্রের বিচিত্র ভাবনাকে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিষয়ের অভিনবত্বের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ভাষারীতির উপস্থাপনা এই সময়ের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

কাবুল যাত্রা

সৈয়দ মুজতবা আলী

আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফ্র, নিস্ফ্ উস্ সফ্র্'–অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরুলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরুতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হয় 'আমি ভয়ঙ্কর একা'। 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন, এসব জায়গায় মানুষ আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিশ আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনো ঠিক 'কগ্নিজেব্ল্ অফেনস' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গোঁয়ার্তুমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাস্তাঘাটে কি করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফ্ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন–তাঁরা খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর তালুক-মুলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না। সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই হয়। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুনখারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু'চারটে পুলিশ দু'-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়স্বজন 'কা তব কান্ত' দর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিম্বা তার সুচতুর আত্মীয়স্বজন আপনার আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতুদ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার জীবনের এই তিনদিনের মুসাফিরীতে কে দু'ঘণ্টা আগে গেল, কে দু'ঘণ্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা রসূলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিশ কেন মিছে আপনাদের তথা খুনী এবং তস্য আত্মীয়স্বজনদের মামলায় আরো ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে খামকা, বেফায়দা তঙ্গ করবে? নির্বিকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিশও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হ্যাঁ, আলবৎ, এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোস্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনীর আত্মীয়স্বজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন–? তখন আফগান পুলিশকে আর দোষ দিয়ে কি হবে!

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন–রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্তানের রাজবর্ত্ম অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফারসী ছাড়া অন্য কোনো

ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরিজী না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরিজী জানেন না তখন তিনি ফারসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারো পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবদে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরী পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু'দিন একাসনে কাটাবেন–আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গণ্ডূষজলের সফরী তাহলে বিপদআপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল–তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরীতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুণীরা বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী! পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু–বন্দুক, গোলাগুলি আর শীতের কাপড়। বাদবাকী প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্যপ্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ার ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল–ছায়াতে। এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালেও একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হোস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভুরু, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁফ পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্যদেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন–সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভুরচ সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়াবার মত সে সব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে–সার হয়ে নূতন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নগ্ন বীভৎস দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলা ভুল–এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এদেশকে শস্য-শ্যামল করার চেষ্টা এখনো সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি–প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসঙ্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কি করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই–তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে–পূরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পূরীর সমুদ্র দর্শনে' অথচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তাও তো নয়। তবু এ সব হল বাঙালীর কিছু কিছু দেখা–সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচ শ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহ্য করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের সুখ-দুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা সয়ে গেলে তার থেকে কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রসও কিঞ্চিৎ বেরুতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনো প্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারী বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরচ করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইণ্ড-স্ক্রীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ঠন নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of songs-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা--"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes."

যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কন্‌কর্ড বহু টীকাটিপ্পনী ঘেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক মুহূর্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় আর খাইবারী বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সঙ্কীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে–তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনি হয়ে কোটি কণ্ঠে পরিবর্তিত হত–এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ডক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলী রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছে। নগ্নচোখে ক'জন লোক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধূ গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অন্ধ বধূর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজীকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরুজামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।'

এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র–গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম–গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উটের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলুবুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরিয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না ককেনই, না আরো কিছু। সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফের্তা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উঁচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুর্দান্ত গরম। পাঠান দু'বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।' রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম কি একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কি করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

খ্রীস্টও তো বলেছেন– Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing."

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী তড়িৎগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়ঙ্গম করলুম, সৃষ্টি যখন তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রুদ্র তাঁর প্রসন্ন-কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশী।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবারপাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ

পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক-পিঙ্। তারপর কি কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না-করে সকলেরই জানা কথা—চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হাসিটুকু গুলি খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে—বাদবাকী উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবারপাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু'টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদীতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ এক্কেবারে চলে যায়। পরের দিন যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে দু'ঘণ্টা লাগল কি করে, তখন সর্দারজী বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলেছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব—কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘষে ঘষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগষ্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নভেম্বরে পুস্তিনের জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!'

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' হঠাৎ দেখি সামনে একি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থাকল। পাসপোর্ট দেখাতেহল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

It is absolutely forbidden
to cross this border into
Afghan territor

কাবুলী বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। আল্হামদুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।'

আমি বললুম, 'আমেন।'

খাইবারপাস তো দুঃখে-সুখে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সঙ্কীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুত্বর লড়াই-জখম থেকে বাঁচাল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কিনা। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটা কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।

বুঝলুম, রাস্তার অবস্থা গ্রীষ্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজীকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে–তা না হলে এ রকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন?

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজী দেশের গাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল ও বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশি টানাহেঁচড়া করতে হল না।

কী দেশ! দুদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসরের রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই–খাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্রবালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রনিঃসরিত ধূম্রপুচ্ছ এই যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ধূম্রপুচ্ছ স্বতশ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈঃশব্দ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তারপর দেখি মৃত্যর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহলসামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কা দুর্গ অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে হল। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে–ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয় বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে–ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে তারি উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজে

সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ঐ সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে গেল। না হলে দক্কা দুর্গ-প্রাকারের অন্ধ কোটর নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তাহলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌঁছতে পারব।'

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালে সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলীর বদলির চাকরির সুবাদে মুজতবা আলীর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন কাটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ১৯২১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। এখানে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, গুজরাটি, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। এরপর তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং দর্শনশাস্ত্র পড়ার জন্য বৃত্তি নিয়ে জার্মানি যান। ১৯৩২ সালে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গবেষণার জন্য তিনি ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৪-১৯৩৫ সালে তিনি মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কাবুলের একটি কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে মুজতবা আলীর কর্মজীবন শুরু হয়। সেখানে তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৫ সালে বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে তিনি বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে তিনি আট বছর কাটান। এরপর দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়ার আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন। পঞ্চাশের দশকে কিছুদিন আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরের দায়িত্বও পালন করেন পাটনা, কটক, কলকাতা এবং দিল্লিতে। ১৯৬১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান এবং অবসরগ্রহণ পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় সেখানে বিশ্বভারতী নামের হস্তলিখিত ম্যাগাজিনে মুজতবা আলী লিখতেন। পরবর্তীকালে তিনি 'সত্যপীর', 'ওমর খৈয়াম', 'টেকচাঁদ', 'প্রিয়দর্শী' প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায়, যেমন–দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, মোহাম্মদী প্রভৃতিতে লেখেন। বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন ভ্রমণকাহিনি, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা। বিভিন্ন ভাষা থেকে শ্লোক ও রূপকের যথার্থ ব্যবহার, হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ৩০। তাঁর উল্লেখ যোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে (১৯৪৯), চাচা কাহিনী (১৯৫২), পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২), জলে ডাঙ্গায় (১৯৬০), অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০), ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ মুজতবা আলী মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

পাঠের অংশটুকু সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' নামক রচনার ৭ম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। গ্রন্থটির শ্রেণি-প্রকৃতি নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও সাধারণভাবে এটিকে ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে 'দেশে-বিদেশে' ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বাংলা ভাষায় দেশভ্রমণকে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'দেশে-বিদেশে' অন্যতম সেরা রসসৃষ্টি। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের অসাধারণ দক্ষতা, সাধারণ মানুষ

সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল এবং সর্বোপরি বর্ণনার রসগ্রাহিতা এই রচনাটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। এসব বিবেচনায় 'দেশে-বিদেশে' সাধারণ ভ্রমণ-কাহিনির তুলনায় অসাধারণ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং শিল্পোত্তীর্ণ পরিবেশনায় এটি বিশেষ স্থানের প্রামাণিক দলিলে পরিণত হয়েছে। বর্তমান অংশটুকু সম্পর্কে উপর্যুক্ত মতামত সর্বাংশে প্রয়োগযোগ্য। এ কারণে 'দেশে-বিদেশে' ভ্রমণকাহিনি হলেও তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্রও এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

পাঠে লেখকের পেশোয়ার থেকে বাসে কাবুল ভ্রমণের অংশটুকু বিবৃত হয়েছে। জনৈক পাঠান আহমেদ আলীর গৃহে এক সপ্তাহের আতিথ্যগ্রহণ শেষে লেখক বাসে কাবুল যাত্রা করেন। পথে খাইবারপাস সড়কের বর্ণনা, প্রসঙ্গক্রমে আফগান আইনি পরিস্থিতি, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রসঙ্গের অবতারণা তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রের একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরে। সর্বোপরি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রকাশের দক্ষতায় রূক্ষ পথের বর্ণনাতেও পাঠক রসের সন্ধান পান। চলিত রীতিতে ক্রিয়া ও সর্বনামপদ অক্ষুণ্ন রেখেও তিনি অবাধে আরবি-ফারসি-আঞ্চলিক ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করে বর্ণনাকে একদিকে যেমন শ্রুতিমধুর করেছেন, অন্যদিকে নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র স্টাইল। ফলে পাঠককে বর্ণনার মাধ্যমে চিত্রকল্প তৈরি করে নিতে বেগ পেতে হয় না।

সুবহে সাদিক

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা–উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া আইস; অগ্রসর হও। ঐ শুন, "মোয়াজ্জিন" আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান-ধ্বনি, আল্লাহ্‌র ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবেহ্ সাদেক–মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে–তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, তাহারা ডাক্তার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধান সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা, কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হইতেছে–আমরা বঙ্গনারী গৃহ-কারাগারে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছি আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।

আমরা নিজেদের জন্য যাবতীয় অভিসম্পাত "রিজার্ভ" করিয়া রাখিয়াছি, আমরা সময়ের গতির সহিত সমপদক্ষেপে নড়িব না। আমরা শপথ করিয়া করিয়া বসিয়া আছি যে, আজানের শব্দ শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিব না। কিন্তু তাহা যে আর হইবে না। ভগিনীগণ! আপনারা স্বীয় কারাগারের ক্ষুদ্র ছিদ্র পথ দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাহিরের জগৎ দেখুন দেখি!

আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুনিয়াছি যে, আমরা জন্মিয়াছি দাসী, চিরকাল দাসী, থাকবি দাসী।

আহা! কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন, –

"মনের মরম ব্যথা প্রকাশিতে নারি,
কত পাপ ছিল তাই হয়েছিনু নারী।"

আমাদিগকে "নাকেসুল আকেল" বলিয়া দুনিয়ার সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধে চাপানো হয়। আমরা মুক বলিয়া কোন কালে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করি নাই। আমাদের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, আমরা তাহাতেই গৌরব বোধ করি।

কিছুকাল হইতে আমাদের প্রভুগণ আমাদিগকে মূল্যবান অলঙ্কারের শামিল গণনা করিতেছে। তাই দেখুন কত প্রকারের "নারী রক্ষা সমিতি" গঠিত হইতেছে। বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ, তখন যাহাতে আমরা চুরি না হইতে পারি, সেজন্য জাগ্রত প্রহরীর প্রয়োজন। আমার অভাগিনী ভগিনীগণ! আপনারা কি ইহাতে অপমান বোধ করেন না? যদি করেন তবে এই নির্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?

একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি–আমাদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হয়; তাই দেখুন, "পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির" পার্শ্বে "নারীরক্ষা সমিতি"। ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপমান আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, এখন এ অপমানের ইতি হওয়া চাই।

ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্য্যতঃ দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্দ্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা। তোমরা নিজের দাবী-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।

শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ! অন্ততঃপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে! শিক্ষা—মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।

শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। এক ধান ভানা ও যাঁতা চালনায় দেশের সর্ব্ববৃহৎ খাদ্য সমস্যা পূরণ হইবে। অধুনা ঢেঁকিছাটা চাউল ও যাঁতায় পেশা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুধু লম্ফ-ঝম্প, নৃত্য ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্ত রূপ শরীরচর্চ্চা শতগুণ শ্রেয়ঃ। খোলা মাঠে প্রাতঃভ্রমণও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। গভর্নমেন্ট এখন শিশুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছে, ভাল কথা, কিন্তু প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা চাই।

যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না,—উঠ, কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও।

লেখক পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজব্যবস্থার কারণে রোকেয়ার প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না ঘটলেও বাড়িতে আরবি ও উর্দু ভাষা শেখার মাধ্যমে গৃহকেন্দ্রিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। আধুনিক মনস্ক বড় ভাইয়ের উৎসাহে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষা চর্চার সুযোগ পান। একাধিক ভাষায় অর্জিত এই দক্ষতা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য-জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। রোকেয়ার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত মুক্তমনা স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহে। স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ভাগলপুরে। সমকালীন মুসলিম নারীসমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই স্কুলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অবরুদ্ধ, পর্দাপ্রথাশাসিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করেও যে আধুনিক চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর উল্লে খযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, মতিচুর ইত্যাদি। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়কে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, যেমন—মুসলিম

নারীসমাজের মুক্তি ও লিঙ্গ-সমতা, নারীশিক্ষা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অসারতা ইত্যাদি। তিনি যথার্থই অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, শিক্ষার্জন ছাড়া মুসলিম নারীসমাজের মুক্তির চিন্তা অবান্তর। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বর প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সুতরাং তার যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও আত্ম-উন্নয়নই শিক্ষার লক্ষ্য। সামগ্রিক বিচারে রোকেয়ার রচনাসমূহ কেবল সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য কিংবা তাঁর ভাষাশৈলী পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং যতদিন লিঙ্গ-সমতা অর্জিত না হয়, ততদিন রোকেয়ার রচনার চর্চা ও বিশ্লেষণ করে যাওয়া জরুরি। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূলভাব

সুবেহ সাদিক প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত একটি জাগরণমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে লেখক প্রতীকী শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীজাতিকে সমস্ত পাশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসরতা অতিক্রম করে জেগে ওঠার আহবান জানান। সুবেহ সাদিক কথাটির অর্থ ভোর বা প্রত্যুষ। প্রত্যুষ যেমন একটি দিনের সূচনা-নির্দেশক তেমনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মনে করেন নারীজাতির জন্য নতুন একটি যুগের সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ যেমন রাতের অন্ধকার পিছনে ফেলে দিনের আলোয় সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথে পা বাড়ায়, তেমনি এই নতুন যুগের সূচনালগ্নে নারীজাতির অগ্রসর হওয়া আহবান এই প্রবন্ধে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। গৃহ-কারাগারে শয্যাত্যাগ করে এবং সামাজিক অসমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহবান ধ্বনিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।রোকেয়ার মনে করেন প্রথমে নারীকেই বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁরা সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক।

প্রবন্ধে অবরোধবন্দিনী মুসলমান নারীসমাজের অধোগতির কারণ, জাগরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে রোকেয়া নারীজাতির অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করে বলেন, তারা নিজেদের জন্য যাবতীয় অভিসম্পাত রিজার্ভ করে রেখেছেন, তারা সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হন না। মূক ব্যক্তির ন্যায় অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করেন না কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাতে গৌরববোধ করেন। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান নারীসমাজে প্রচলিত প্রথা নারীজাতিকে কিভাবে মানসিক দাসত্ব দান করেছে এবং সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতিতে মুসলমান নারী কী ভূমিকা পালন করতে পারে ইত্যাদি প্রসঙ্গে রোকেয়ার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ এই প্রবন্ধ বিবৃত হয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে সুবহে সাদিক বাঙালি মুসলমান নারী-জাগরণের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী প্রকাশনা। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও কালের সীমা অতিক্রম করে বর্তমান বাংলাদেশে এটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নারীমুক্তি কিংবা নারীর ক্ষমতায়নের সোপানগুলি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। নিঃসন্দেহে এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। রোকেয়ার যথার্থই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত এই অবস্থার পরিবর্তন কিংবা নারীর উন্নয়নের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। এই শিক্ষার স্বরূপ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একাত্তরের চিঠি

বহরমপুর নদীয়া, ভারত ০২/০৮/১৯৭১

মা,

তোমার শরীর ও মন ভালো আছে তো? আমি কোনো মতে বেঁচে আছি। তোমার দোয়া ও আল্লাহর রহমত ছাড়া কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের গোয়ালগাঁ যুদ্ধ থেকে কোনোভাবেই বাঁচতে পারতাম না। তোমার চোখের জল আর বুকের যন্ত্রণা অবশ্যই থাকবে না। গত দশটি দিন আমি গ্রেনেডের আটটি স্প্লিন্টার-এর যন্ত্রণা নিয়ে বহরমপুর হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডের ১৬ নং বেডে খুব কষ্টে আছি মা। আমি তোমার একমাত্র দুরন্ত সন্তান। মাষ্টারদার সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমি প্রথম হয়ে পাস করেছি। কাজেম, হযরত, সামাদ, রজব স্যারের স্নেহ ও আদর আমি কখনো ভুলতে পারি না। সিক্স ও সেভেনেও আমি প্রথম হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। মা, গোয়ালগাঁ এর তোফায়েল উদ্দিনের বাড়িতে গত ২২/০৭/১৯৭১ তারিখের রাত্রিতে ২৫ সদস্যের উচ্চ প্রশিক্ষিত একটি প্লাটুন নিয়ে অবস্থান নিলাম দুই কিলো দূরে মঠমড়িয়া গ্রামে এক পাকসেনা ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। ৪০/৫০ জন পাকসেনা ও রাজাকার মিলে ১০০ জনের দলটিকে নিশ্চিহ্ন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাড়িওয়ালা টিনশেডের পাকা দুই রুমে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। জানো মা, গোয়ালগাঁও-এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হাইলি নদীতে এখন প্রচণ্ড স্রোত আর পানিতে ভরপুর। এখন বর্ষাকাল, চারিদিকে পানি আর পানি! বাড়িওয়ালা পুঁটি ভাজি, শোল মাছের ঝোল আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে আমাদের খাইয়েছিলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে রাত তিনটায় ওই পাকসেনা ক্যাম্প আক্রমণ করব। কিন্তু বাড়িওয়ালার এক চাকর ওই পাকসেনা ক্যাম্পে রাত এগারোটার দিকে আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে আসে। আমি, লতিফ ভাই, আব্দুল্লাহ্, ওয়াজেদ, মমিন ও কাশেমসহ আরও অনেকেই এলএমজি, থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রপাতি দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করে রেখে ঘুমিয়ে গেছি। একজন পাহারায় আছে। রাত একটার দিকে একদল পাকসেনা অতর্কিতে ওই বাড়িতে প্রবেশ করতেই আমাদের পাহারাদার জিজ্ঞেস করে, কে? উত্তরে উর্দুতে বলে 'তোদের জোম হ্যায়।' বলেই তাকে গুলি করে। এরপর আমাদের দুটো রুমকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু হলো, আমাদের রুমের দরজাটা ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা করে দিল। এক পর্যায়ে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করল, বিস্ফোরিত হয়ে আমিসহ কয়েকজন রক্তাক্ত জখম হলাম। আমার তলপেটে, দুই উরু ও পায়ে মোট আটটি স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়ে যখন মৃত্যুর কাছাকাছি, তখন পেছনের জানালার কথা মনে পড়ল। রাইফেলের বাঁট দিয়ে জানালার চারটি শিক ভেঙে ঘরের পেছনের গোবরের পাংগোছের মাইটিলে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ধপাস করে পড়ে মনে হলো আমি যেন গোবরের মধ্যে আটকে যাচ্ছি। প্রচণ্ড শীত, অবিরাম রক্তক্ষরণ, বৃষ্টির ন্যায় গোলাবর্ষণ আর অন্ধকার ভুতুড়ে পরিবেশে আমি কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে একটি পুকুরের ঢালুতে ঢোলকলমি আর দাঁতছোলা গাছের ঘন ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সকাল দশটার দিকে কয়েকজন লোক আমাকে খুঁজে পায়। এরপর কলার ভেলাতে করে হাইলি নদী ও তারপর নৌকায় শিকারপুর। সেখান থেকে বহরমপুর হাসপাতালে আসার এক দিন পর আমার জ্ঞান ফেরে। মা, আমার প্রাক্তন সৈনিক বন্ধু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে শিয়ালকোট সেক্টরের বীর সেনানী সুবেদার মেজর আব্দুল লতিফ আমার অজ্ঞান রক্তাক্ত দেহকে কাঁধে করে কাদা ও পানির মধ্যে কয়েক মাইল হেঁটে নিয়ে এসেছিল। বন্ধুবর লতিফের ঋণ আমি কোনোদিন কিছু দিয়েও পরিশোধ করতে পারব না। জানো মা, আমার তলপেট ও দুই উরু হতে মোট পাঁচটি স্প্লিন্টার ডাক্তারগণ

অপারেশন করে বের করেছেন। বাকি তিনটি এখনো আমার শরীরে বিদ্ধ আছে। ডাক্তার বলেছেন, এই তিনটি মাংসের সঙ্গে হজম হয়ে যাবে। মা! তুমি তো চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকো আমার একটি চিঠি বা সংবাদের জন্য। কিন্তু এত মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক কথা কিভাবে প্রকাশ করে তোমাকে জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। জানো মা, আমাদের আশ্রয়দাতা তোফায়েল উদ্দিন ভাই-এর পুরা পরিবার সেদিন কিভাবে চোখের পলকে নিঃশেষ হয়ে গেল! পাকসেনাদের অত্যাধুনিক চায়নিজ এলএমজির ব্রাশফায়ার-এর মধ্যেই আমরা আল্ল াহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল সাহস নিয়ে রাশিয়ান থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি আর কিছু গ্রেনেড ও গোলাবারুদ নিয়ে বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছি। আমরা ছিলাম আধা ঘুমন্ত, ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ ও অপ্রস্তুত। এই অবস্থায় যে যার অবস্থান থেকে অতি সতর্ক ও ধৈর্যের সাথে অত্যাধুনিক নানা অস্ত্রে সজ্জিত ও উচ্চ প্রশিক্ষিত পাকসেনাদের মোকাবিলা করেছি। কিন্তু জানো মা, আমাদের উভয় পক্ষের বৃষ্টির মতো গোলাগুলির মাঝে দৌড়াদৌড়ির কারণে বাড়িওয়ালা তোফায়েলউদ্দিন, তাঁর শাশুড়ি, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে, আমাদের এক বীর সহযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন এবং আরেক সহযোদ্ধা মমিন চরম আহত ও মুমূর্ষু ও অজ্ঞান অবস্থায় বহরমপুরের এই হাসপাতালে আমার চোখের সামনেই মৃত্যুর কোমল স্পর্শে মিশে গেল চিরদিনের মতো। মা, মমিন আমাকে বড় কষ্ট দিয়ে চিরদিনের মতো চলে গেল!! আমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে সামান্য কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু এখানে সে একটি কথাও বলল না। ওয়াজেদ ও মমিনকে হারিয়ে আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি মা। সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে, ওয়াজেদ ছিল বাবা-মার একমাত্র সন্তান। দেশ স্বাধীন হবে ঠিকই কিন্তু ওয়াজেদ-মমিনদের সেই স্বাধীন দেশে কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানো মা, আল্ল্া হর কী লীলাখেলা! তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এর চার মাসের একটি ছেলে কি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল সেদিনের যুদ্ধে। উভয় পক্ষের ব্রাশফায়ারের মধ্যে পড়ে তার পরিবারের সবাই মারা গেল ঠিকই কিন্তু চার মাসের নিষ্পাপ অবুঝ শিশুটি লেপ-কম্বলের নিচে থাকায় কোনো এলএমজির গুলি তাকে স্পর্শ করেনি। মা, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আমি যেন সুস্থ হয়ে আবার স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পারি। মা, তোফায়েলউদ্দিনের চার মাসের শিশু মুক্তিকে কে লালন-পালন করবে? কে বুকের দুধ খাওয়াবে? তার বাড়ির চাকরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজের মতো অবস্থা হলো তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এর, শহীদ হলো ওয়াজেদ, মমিন আর আহত হলাম আমরা কজন। মা, আর লিখতে পারছি না। চিঠিটা সাবধানে পড়বে। আমি যদি বেঁচে থাকি, দেখা হবে ইনশাল্লাহ।

ইতি

তোমার রণাঙ্গণের যোদ্ধা সন্তান রহিম/বহরমপুর হাসপাতাল, ভারত।

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহিম। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ৪২ টাইগার রোড, ওয়ার্ড-৩, নওদাপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া। চিঠি প্রাপক : মা মেহেরুন্নেসা। মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম হারান মণ্ডল। চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

মূলভাব

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আত্মপরিচয়ের সন্ধানে ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার যে বীজ রোপিত হয়েছিল, দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ নামক সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সফল পরিণতি ঘটে। সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের মূলে প্রোথিত সত্তা, আমাদের অস্তিত্বের অংশবিশেষ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে

ওঠেছে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংগীত-সংস্কৃতির মূল বিষয়-আশয়। মুক্তিযুদ্ধকে বারবার আবিষ্কার করা হয়েছে গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায়, পত্রসাহিত্যে। বর্তমান পাঠে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা হয়েছে একটি বিশেষ আঙ্গিক–চিঠিপত্রের মাধ্যমে। দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে মিশেছিল মৃত্যুভয় অতিক্রমকারী বীরত্ব, দেশমাতৃকার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রবল বাসনা। তবু আত্মীয়স্বজনদের প্রতি তাঁদের মমত্ববোধ বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পরিবারকে স্মরণ করেছেন। প্রতিনিয়ত চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন তাঁদের আবেগের কথা। এ ধরনের চিঠির সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ২০০৯ সালে 'প্রথমা' প্রকাশনীর উদ্যোগে প্রকাশিত একাত্তরের চিঠি শীর্ষক বইতে। আবেগের অসাধারণ প্রকাশে এর প্রতিটি চিঠি হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক দলিল, অসাধারণ এক-একটি রচনা। বর্তমান পাঠে উক্ত সংকলনগ্রন্থ থেকে একটি চিঠি সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই চিঠিতে মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহিম তাঁর মায়ের কাছে যুদ্ধের বিভীষিকার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি তাঁর ছেলেবেলার কথা স্মরণ করে বলছেন, বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন। পঁচিশ সদস্যের একটি প্ল াটুন নিয়ে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়, যার মাঝে তিনিও ছিলেন। তাঁরা জনৈক তোফায়েলউদ্দিনের বাড়িতে আশ্রয় নেন আক্রমণের জন্য। কিন্তু তোফায়েলউদ্দিনের এক গৃহকর্মী পাকসেনাদের তাঁদের অবস্থানের কথা জানিয়ে আসে। পাকবাহিনী তাঁদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে। আক্রমণে তোফায়েলউদ্দিনের শিশুপুত্র ছাড়া সবাই মারা যায়। বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহিমের সহযোদ্ধারা শহীদ হন। তিনি আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। তিনি তাঁর মাকে নিরাপত্তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে চিঠিটি সাবধানে পড়তে বলেছেন।

অধ্যায় ৮

নাটক

নাটকের স্বরূপ

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ মাধ্যম। নাটকের মধ্য দিয়ে জীবনের ও সমাজের বিভিন্ন চিত্র মানুষের সামনে প্রতিফলিত হয়। নাট্যকার ও আলংকরিকগণ নাটককে কাব্য সাহিত্যের অংশ ও শ্রেষ্ঠ ধারা বলে বিবেচনা করেছেন। দৃশ্য কাব্য ও শ্রাব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত গতিমান জীবনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে নাটক। নাটক হচ্ছে দেখা ও শোনা এই দুই গুণ বিশিষ্ট কাব্য। অর্থাৎ নাটক প্রধানত দৃশ্য কাব্য এবং এটা সকল প্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ সঙ্গত কারণে বলেছেন, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় ও দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করাই নাটক (শ্রীশচন্দ্র দাস, ২০০৫)। এ জন্য রঙ্গমঞ্চই নাটকের বিকাশ ও স্ফূর্তির স্থান। মঞ্চকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত এ জীবন-নাট্য দর্শকবৃন্দ উপভোগ করেন। নাটকের একটি থিম বা বিষয়বস্তু থাকে। একটি নাটক ঘটনা, কাহিনী, কেন্দ্রীয় চরিত্র, অন্যান্য চরিত্র এবং সংলাপ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গঠিত হয়। নাটকের স্বরূপ নিয়ে অ্যারিস্টটল বা ভরত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও এ-বিষয়গুলোর অবতারণা করেছেন। নাট্যকার নাটকের এ স্বরূপ তাঁর নাটক রচনায় প্রয়োগ করলে কাহিনী রচনা, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রায়ন এবং সংলাপের মাধ্যমে নাটকের থিমকে সামনে এগিয়ে নিতে পারবেন। দর্শক বিষয়বস্তুর মধ্যে তাঁদের জীবনবোধ ও জীবনযাপনের আনন্দ-বেদনা খুঁজে পাবেন। থিম বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘটনার বিন্যাস ঘটে, ঘটনা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় প্রধান চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্র। নাটকের এই চরিত্র ও বিষয়বস্তুকে কার্যকর ও শিল্পরূপ দান করে সংলাপ।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

নাটক প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন- ট্র্যাজেডি বা বিয়োগাত্মক নাটক (মুনীর চৌধুরীর রক্তাক্ত প্রান্তর) ও কমেডি বা ব্যঙ্গাত্মক নাটক (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস)। ট্র্যাজেডি নাটকে জীবনের দুঃখময় উপলব্ধি এবং করুণ রসের প্রকাশ হয়। আর কমেডি নাটকে জীবনের আনন্দ, মিলনাত্মক ভাব ও হাস্য রসের প্রকাশ হয়। ঐতিহাসিক নাটক যেখানে নাটকের বিষয়বস্তু অতীত ইতিহাসের কোনও অধ্যায় অবলম্বন করে লিখিত (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান, নুরজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত), প্রহসন হালকা সংলাপ, লঘু কল্পনাময়, স্থূল হাস্যরস ও আতিশয্যব্যঞ্জক নাটককে বোঝায় (মাইকেল মধুসূদন দত্তের একেই কি বলে সভ্যতা, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী) ইত্যাদি। এছাড়াও নাটকের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যেমন- সামাজিক নাটক, বিদ্রূপাত্মক নাটক, বাস্তব নাটক, ভাবপ্রবণ নাটক ইত্যাদি। সামাজিক নাটক সমাজ জীবনের নানান জটিলতা,

পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব, আদর্শহীনতা, মানবিকতাবোধ, শ্রেণি ভিত্তিক চিন্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার অধ্যায়, রাজা, মুক্তধারা ইত্যাদি)। তাছাড়া রাজনৈতিক নাটক, লৌকিক নাটক, পৌরাণিক নাটক (এ নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ বা প্রাচীন ধর্মমূলক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত, যেমন- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা) ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ পর্যন্ত (১৭৫০-১৮৪৯) কলকাতায় অবস্থানরত ইংরেজ বণিক, বেনিয়ান, প্রশাসক, শিক্ষক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের সাংস্কৃতিক রসরুচি পরিতৃপ্তির মাধ্যম হিসেবে ইংরেজ-স্থাপিত বিভিন্ন নাট্যশালা গড়ে ওঠে। এ সময় পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে বাঙালির প্রথম প্রয়াস লক্ষ করা যায় হিন্দু কলেজের ছাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১-১৮৬৮) হিন্দু থিয়েটারে (১৮৩১) জুলিয়াস সিজারের অংশবিশেষ অভিনয়ের মাধ্যমে। এ ধরনের ইংরেজি নাটক অভিনয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণির বিনোদনের উপাদান হতে পারলেও বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিনোদনের উপাদান হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ছাড়িয়ে এ সময় মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে পৌরাণিক, লোককাহিনী ও সমকালীন সমাজের বাস্তবতাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুকে নিয়ে এ মৌলিক নাটক রচনার আগ্রহ দেখা যায়।

এ সময় যেসব মৌলিক নাটক রচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮), মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)।

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে সমকালীন বাংলা নাটকের বিকাশের বিষয়গত ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য সহজে লক্ষ করা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ব্যতীত বর্ণিত সকল নাটক তৎকালীন সমাজচিত্রের বাইরের বিষয় নিয়ে রচিত। তখনকার সত্যিকার বাস্তব ছিল দেশি-বিদেশি নীলকর অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদিও প্রথম ট্র্যাজেডি রচনার সূত্রপাত করেন তবু এ সত্য অনস্বীকার্য যে, দীনবন্ধু মিত্র প্রথম বাংলা ভাষায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকূলসর্বস্ব' দিয়ে অনেকাংশে সার্থক বাংলা নাটকের সূচনা হলেও মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে এবং দীনবন্ধু মিত্র তা জনজীবনের সাথে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

এরপর বাংলা নাটক আরও সমৃদ্ধ করেছেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) প্রমুখ নাট্যকার।

নাটকের অবয়ব ও উপাদান

নাটক লেখার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় সামনে রাখতে হয়। একে নাটকের কাঠামো বলা যেতে পারে। সনাতন নাট্যকারগণ নাটকের তিনটি ঐক্য মেনে চলতেন- সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। প্রত্যেক নাটক সাধারণত পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত-প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থি-মোচন ও উপসংহার। তবে একাঙ্কিকা নাটকের প্রচলনও আছে। একাঙ্ক নাটক একটি অঙ্ক এবং বস্তুতপক্ষে একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক।

কাহিনীকে নাটকের দেহ বলা হয়। নাটকের থিম বা মূলভাবকে তুলে ধরার জন্য কাহিনী রচনা করা হয়, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপসৃষ্টি করা হয়। কাহিনী রচনার জন্য নাট্যকারকে জানতে হয় ঘটনা নির্বাচন, প্রারম্ভ, সময় ক্রম, দৃশ্যায়ন, ক্লাইমেক্স, সংলাপ সৃষ্টি। নাটকে চরিত্র ও সংলাপের সম্পর্ক, এবং চরিত্র ও সংলাপ কীভাবে কাহিনী গড়ে তোলে তা জানতে হয় নাট্যকারকে। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত নাটক এক বহু বিচিত্র উপকরণ, উপাদান, রীতি-পদ্ধতির সর্বাত্মক ফলিত (ব্যবহারিক) বা ক্রিয়াত্মক শিল্প-পরিবেশন বা composite art (কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪)। লিখিত সংলাপ উচ্চারণের মাধ্যমে যখন অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁদের প্রত্যেকের ওপর আরোপিত চরিত্রের রূপচ্ছবির ছাপ ফেলেন দর্শক শ্রোতাদের মনে, তখন উচ্চারণ-স্বরক্ষেপণ-কণ্ঠশৈলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নির্মাণ করতে হয় অবাচনিক বা অভাষিক শরীর ভাষা- চোখের চাউনি, মুখভঙ্গি, চলাফেরা, হাতের মুদ্রা ইত্যাদি নানা ছোট ছোট সংকেতে। একটি নাটক কণ্ঠশৈলী, শারীরিক-ভাষা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ধ্বনি, আলোক কৃৎ-কৌশল এবং রূপসজ্জা ইত্যাদির যথাযথ সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। তাই নাটক প্রকৃতই ক্রিয়াত্মক শিল্প পরিবেশনা।

কবর

মুনীর চৌধুরী

[**চরিত্র :** নেতা, হাফিজ, ফকির, গার্ড ও ছায়ামূর্তি কয়েকটি ।]

দৃশ্য: গোরস্তান, সময় : শেষ রাত্রি।

(মঞ্চে কোনরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

চার ফুট উঁচু একটি পুরু কালো কাপড়ের মজবুত পর্দা দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত; লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কি ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চের ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্ল াস, খালি। একটি র‍ুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এইমাত্র তাহার উপর কেহ বসিয়াছিল। সেই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবার ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতরে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল–)

নেতা : গার্ড। গার্ড!

(নীল কোর্তা পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরী ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক; কিন্তু আপাততঃ একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত ভাব। হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ।)

গার্ড:জী হুজুর! (দ্রুত নিঃশ্বাস)

নেতা : কী রকম গার্ড দিচ্ছ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা? ছিলে কোথায় এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ডাকছি কোন সাড়া নেই।

গার্ড : পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠাণ্ডা আর আন্ধার হুজুর যে কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা : তোমার পোষ্টিং কোথায় ছিল?

গার্ড : ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারের শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা : ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছো? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন?

গার্ড : (চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে) ওহ্! অ্যাঁ পইড়া গ্যাছলাম। তাড়াতাড়ি কইরা আইতে গিয়া পইড়া গ্যাছলাম গর্তের মধ্যে।

নেতা : গর্তে?

গার্ড : কবর। পুরান কবর হইবে। একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই একদম ভস্ কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা : idiot! চোখ মেলে পথ চলো না? খেলার মাঠ পেয়েছ নাকি? এটা গোরস্তান। সাবধানে পা ফেলতে পার না? যাও। ডিউটিতে যাও।

(অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোর্ট মাফলার চাদর জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।)

গার্ড : জী হুজুর। (স্যালুট)

নেতা : যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে পোড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোন কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম। বাতিটা জ্বালিয়ে দিও।

গার্ড : জী হুজুর। (স্যালুট। প্রস্থান)

ব্যক্তি : (নেতার পিছনে) তখনই বলেছিলাম স্যার এসব আজেবাজে লোক—

নেতা : (চমকাইয়া) কে? তুমি কে?

ব্যক্তি : আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা : ওহ! আপনি! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চমকে উঠেছিলাম। ভবিষ্যতে ওরকম আর করবেন না। না, ভয় পাইনি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি। তবু ডাক্তার বলেছে আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কী বলছিলেন বলুন—

(বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে। ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতের দিকে।)

হাফিজ : এই বলছিলাম, এসব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পণ্ড করাতেই বেটারা বেশি পটু।

নেতা : তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুঁড়লেও অমন লোক জুটতো না।

হাফিজ : এটা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবি হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এজন্যই তো আজকাল কোন অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এগুলো খুঁজে পাবেন না স্যার!

নেতা : হুম্ (ব্যাগটা আবার দেখে। চারদিকে কি যেন খুঁজিতেছে)।

হাফিজ : তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তাছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোন দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়ে ওগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার উপর শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট করে...

নেতা : কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন! (দাঁড়াইয়া পড়িয়া খুঁজতে থাকে।)

হাফিজ : কিছু খুঁজছেন স্যার?

নেতা : হ্যাঁ। একটা বোতল, ঐ গ্ল াসটার পাশেই ছিল। ভূত-জিনে আমি বিশ্বাস করলেও, তারা কেউ এসে একেবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে−মনে হয় না। একটু আশেপাশে খুঁজে দেখুন তো, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি।

হাফিজ : ব্যাগের ভিতর পুরে রাখেননি তো?

নেতা : না। ওগুলো ভরা বোতল! এটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ : ওহ! তাই তো। এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা! না না। ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতলটা কী রকম স্যার?

নেতা : না খেয়ে থাকলে বোঝানো যাবে না।

হাফিজ : না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ্-গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা : ওহ্ খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ : (দর্শকদের দিকে পিছন দিয়া, মঞ্চের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কী খোঁজে। তারপর মাটিতে একবার হাত ঠেকাইয়াই চিৎকার করিয়া উঠে।) পেয়েছি! পেয়েছি! স্যার এই যে! এইটে না স্যার?

(একটি খালি মদের বোতল তুলিয়া দেখায়।)

নেতা : অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোন দিন ভয় পাইনি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্তান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে। আপনাকেও বলেছি একবার, দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ : কিন্তু মানে, একদম খালি যে স্যার!

নেতা : তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতলসুদ্ধ সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই

আমাদের জন্য এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্ততঃ ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ : ভয়? কী যে বলেন স্যার। মানে আমি ভেবেছিলাম হয়ত এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগেই ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়তো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের উপরই হয়ত আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামী জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার!

নেতা : আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েৎ সরকারী কর্মচারী। এত দরদী লোক বুঝিনি।

হাফিজ : সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা : আপনার এ চাকরি নেয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আপনার পা সুদ্ধ কাঁপছে।

হাফিজ : অ্যাঁ! পা? টলছে–মানে, কাঁপছে? ওহ! হ্যাঁ, তাই-তো ইস্ কি বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, অ্যা?

(নেতা তখন হোঁৎকা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।)

নেতা : ওদিককার কাজ কতদূর এগুলো? আর কতক্ষণ দেরী হবে?

হাফিজ : প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণ সব চুকেবুকে যেত। গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে–কখন সব শেষ করে ফেলতাম।

নেতা : গোলমাল? এখানেও গোলমাল? গোরস্তানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার। ঐ গোর খুঁড়েগুলো দু'-একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরী হয়ে গেল।

নেতা : আপত্তি? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোন গোলমাল করেননি তো? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ : সে কী স্যার, আমি বুঝিনি? সরকারের কাজে সরকারী টাকা খরচ করতে আমি পিছ-পা হব কেন? তবে ঐ ছোটলোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা তাতেই তো যত ফ্যাঁকড়া বাধে। মজুরি তো ষোল আনা আদায় করবেই, তার উপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টিনষ্টি–কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার!

নেতা : আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কী ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ : হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলতে হয়েছে। তার উপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায়নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে-কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা : এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি আমার হার্ট একটু উইক! বেশি স্টেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ : যা হবার তাই হয়েছে। টানা-হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ির মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরাগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বুঝবার উপায় নেই, কোনটার সঙ্গে কোনটা যাবে।

নেতা : তাতে কী হয়েছে? (নতুন বোতল খুলিবে)

হাফিজ : আরেকটা খাচ্ছেন স্যার? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বল াম আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কী দরকার। একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা : Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে। সকালে একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেন্ডেশন লিখে দেব।

হাফিজ : মেহেরবানী স্যার! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। ব্রিটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনও সেই দশা! যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কী করে? আমাদের তো কোন রাজনীতি নেই স্যার!সরকারই মাবাপ! যখন যে দল হুকুমত চালায় তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা : এর মধ্যে গোলমালটা কিসের? আপত্তি উঠলো কোথায়?

হাফিজ : অ্যাঁ? ওহ্। ইয়ে-মানে, ঐ গোর-খুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা "কভি নেহি।" বলে কিনা মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই– তার উপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হতে পারে না, "কভি নেহি!" গোঁ ধরে বসে রইল। কত বুঝালাম।

নেতা : আহাম্মকী করেছেন। সরকারী কাজ করেন কি-না! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশী মতো কাজ করতে দিলে আপনার ইজ্জত ডুবত? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে–আজান পড়বে–কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন?

হাফিজ : আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা : তাহলে এতক্ষণ দেরী হচ্ছে কেন?

হাফিজ : ঐ তখনই তো স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাঁকড়া বাধল। কোত্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা : কে? আপনাকে এতবার করে বলছি, দম্‌কা দম্‌কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবেন না। ধড়াক করে বুকে লাগে! যা বলবার তা নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পারেন না? (বুকে হাত বুলাইয়া) এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার?কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি?কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কী করে? গার্ডগুলো কী করছিল?

হাফিজ : এখানেই থাকে স্যার। গোরস্তানের বাইরে কখনও যায় না বলেই তো ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল! বদ্ধ পাগল!

নেতা : হুম!

হাফিজ : লোকটা এমনিতে ভাল লেখা-পড়া জানে। ভাল আলেম, গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করত। তেতাল্লি‍‍শের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে মা-বৌকে মরতে দেখেছে! কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্তান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে : মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়! মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্র্যাজিক স্যার।

নেতা : অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ : চাকরি। চাকরি স্যার। চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা : বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন? মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি গোলমালটা কিসের! লাশগুলো মাটি চাপা দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ঠাণ্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। (বোতলটা আগাইয়া দিয়া) এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ : আপনার সামনে স্যার? তার উপর এখন, স্যার, নন ডিউটি-

নেতা : তাকালুকের সময় নেই। লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চট্‌পট্‌ কাজটা শেষ করে ফেলুন।

হাফিজ : বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার?

নেতা : কেন, চুসনি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি?

(হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া...) হাফিজ : এ মালটা স্যার আরো ভাল। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা : মুর্দা-ফকির লাশগুলো দেখেছে?

হাফিজ : অ্যা! ওহ্ হ্যাঁ, মানে না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলাফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোত্থেকে হঠাৎ হুস্ করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধ হয় আড়াল থেকে গোর-খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কী তুখোড় বক্তৃতা। আমি তো গোর-খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ-ব্যাটাই না কোত্থেকে উড়ে এসে ওদের বুঝাতে শুরু করলো : কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুন তো কী সব বিদঘুটে কথা!

নেতা : ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার। মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফয়দা কি? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এলো। ওকে ওই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হলো না! (ঘড়ি দেখিয়া) এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা : (গ্লাসে চুমুক দিয়া) না। কাজটা ঠিক হয়নি। এসব ফকির দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়! কোত্থেকে কী উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে।

হাফিজ : লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারতো না। রক্ত-মাংসের স্তূপ। দেখে ও কী বুঝবে? এ রকম লাশ তো ট্রেনচাপা মড়ারও হতে পারে।

নেতা : গুলি চলছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে এফোঁড়-ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক–শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌঁছেনি তা ভাবতে আমি রাজি নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ : মুর্দা-ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ও তো এক রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে–এত কথা বুঝবার মতো জ্ঞানবুদ্ধি ওর নাই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়–কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে–খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল।

নেতা : কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তা তো ও দেখেছে। সকাল বেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

হাফিজ : আপনারা লীডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি অফিসার, হুকুম তামিল করেই খালাস। কী করতে হবে?

(স্তব্ধতা)

নেতা : ওটাকে সুদ্ধ পুঁতে দাও।

হাফিজ : অ্যাঁ? কী বলছেন স্যার? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার। আর খাবেন না এখন।

নেতা : আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো বিশ-পঁচিশ হাত–যত নিচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনদিন যেন আর উপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে উপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ : আপনি বড় এক্সাইটেড স্যার! এসব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার! এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিং-ই এ জন্য অন্য রকম। কোন সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা : পুঁতে ফেল।

হাফিজ : ভুল, খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যার খুব coolly করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমত প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা : যান, তাড়াতাড়ি যান! আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশিক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ : অ্যাঁ! ওহ্- হে হে হে! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক–কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাব। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। এই নতুন বোতলটা কেমন স্যার?

নেতা : (চোখ তুলিয়া) আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। (গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)

(নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই! সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্ল াস চুমুকে চুমুকে শেষ করিয়াছে।)

ফকির : (হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া) ঝুটা। (হাফিজ ও নেতা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)

নেতা : কে?

হাফিজ : অ্যাঁ! ওহ্ আপনি?হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর।

ফকির : ঝুঁটা মিথ্যাবাদী! আমাকে চিনতে পারে না–এ-গোরস্তানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝো? দেখলে চিনতে পারবে?

হাফিজ:সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির : ঝুটা! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না। তুমি বাচাল, না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমীকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নিচে ওরা থাকবে না। উঠে চলে আসবে।

হাফিজ : আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন?

ফকির : বাবা। তোমরা শহরের অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্তান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নিচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরি করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন?

হাফিজ : হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির : এই তো ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা! তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট করিয়েই ওপার চালান করে দেবে। পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি!

হাফিজ : সালাম হুজুর! আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার?মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির : সাবাস বেটা। তোর নজর খুলছে।

হাফিজ : তা হুজুর এখন অনুমতি দিন ওদের পার করে দি।

ফকির : না, আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে এক্কেবারে তোমাদের ঢাকা মোটর গাড়ির ভেতর গিয়ে উঠলাম।

নেতা : ইন্সপেক্টর।

ফকির : প্রথমে দেখে মনে হলো ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনটার বুকের কাছে এক খাবল গোশত নেই, কোনটার ফাটা খুলি দিয়ে কী সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়ালশকুনে খামছে কামড়ে একটু খারাব করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দেখি–না তাও ঠিক নাই। উহুম!

হাফিজ : সে কি হুজুর। ঠিক। সব তো ঠিকই আছে।

ফকির : চোপরাও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারি। আমি শুঁকে দেখেছি গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ : গন্ধ?

ফকির : বাসি মড়ার গন্ধ আমি চিনি। এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন–এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ : ওহ্! তাহলে বলুন কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির : ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানব না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ : খোদা হাফেজ।

(ফকির কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কিছু শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরও শুঁকে দেখে।)

ফকির : না, আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি–(আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখচোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া) উহ্! তাই বলো! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কি ভুলই না করেছে!

নেতা : ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির : গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কী করছো? যাও তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। গন্ধ শুঁকে তোমাদের গায়ে মুখে পাই মড়ার গন্ধ। তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ, এরকম ফাঁকি দেয় না! আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস্! গোর–খুঁড়েরা কী ভুলই না করেছে! না, না এ তো হতে পারে না–

(বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বেসামাল।)

হাফিজ : হে হে হে হে স্যার! সব খতম স্যার। আমরা এখন ফ্রি! দেখলেন তো, পাগলটাকে কী রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে এত হুজুর হুজুর না বললে হয়ত গায়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা : ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ : ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না স্যার। তাহলে আমিও আপনার সম্পর্কে দু'একটা হক্ কথা বলে ফেলবো কিন্তু।

নেতা : যেমন?

হাফিজ : যেমন? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দেবো।

নেতা : মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মতো উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কী করে?

হাফিজ : অনেকদিন হলো এ-লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝবো না?

নেতা : সবটা ঠিক ধরতে পারেননি। উঠতে হয়ত কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কী, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হাফিজ : বিশ্বাস? হ্যাঁ! পারবেন। তা পারবেন। আমি, আমার ব্রেনটা ঠিক আছে। যেকোনোও পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারবো। তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামোকাই একটু বেশি কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা : ভয়? ভয় কিসের? তুমি মনে করেছো ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই। এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাবো। কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন–ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে। হাফিজ : কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায়–কী করবেন তখন আপনি?

নেতা : সব্বাইকে, আপনাকে সুদ্ধ, এক সঙ্গে পুঁতে ফেলব।

হাফিজ : আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করিনি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসেও, আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসবো। দেখবো। এগিয়ে যাবো। হাত মেলাবো। ভয় কিছুতেই পাবো না। (নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া) গ...লা টিপে ধরে রাখবো। যাতে বুকের মধ্যে ভয় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন স্যার? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে। (ততক্ষণে পার্টিশনের ঐ পাশ হইতে সকলের অলক্ষ্যে প্রজ্বলিত আলোকশিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। মূর্তি নিশ্চল। নেতা যখন শেষ বারের মতো ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন তখন ঐ স্তব্ধ মূর্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কী যেন ছুড়িয়া মারিল। কাঁচের গ্লাসে ঝন্‌ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চিৎকার!)

হাফিজ : গুলি। গুলি স্যার! শুয়ে পড়ুন শিগগীর! গুলি!

(দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিস্পন্দন মুখ! কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা।)

নেতা : (চাপা স্বরে) গুলি যে বুঝলে কী করে?

হাফিজ : দেখেছি!

নেতা : কে ছুড়েছে তুমি দেখেছো?

হাফিজ : না। তবে কী ছুড়েছে দেখেছি।

নেতা : কোথায়?

হাফিজ : বেশি নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কিনা। (উপুড় হইয়া একটু চারদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কী তুলিয়া দেখে) ধরুন পেয়েছি।

নেতা : (হাতে লইয়া) একি? এ যে বুলেট। রক্তমাখা।

হাফিজ : গুল্‌লী! গুল্‌লী, ভয় পাবেন না স্যার। ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড। ট্রাকের ভিতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়ত খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা : ও! তাহলে বলো কিছু না। মুর্দা ফকির–সে তো জ্যান্ত আদমি। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ : এখন উঠে পড়া যাক স্যার! মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কি!

নেতা : ইন্সপেক্টর!

হাফিজ : জী!

নেতা : আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে–যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ : (ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থির কণ্ঠে) উঠে এসেছে।

নেতা : কে?

হাফিজ : সেই লাশটা!

নেতা : লাশ? কোন লাশটা?

হাফিজ : বুলেট খাওয়া ছাত্র। খুলি নেই!

নেতা : ওহ্! কী চায়?

হাফিজ : চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব?

নেতা : কী জিজ্ঞেস করবে?

হাফিজ : এ কী চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি–এই সব?

নেতা : আমাদের কথা বুঝবে?

হাফিজ : ট্রাই করতে হবে। সব লাইনেই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুললি অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হতে বাধ্য। কিন্তু অন্যরকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না।

ফেইস করতেই হবে। (উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।)

নেতা : আপনি কিন্তু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাক্কা।

হাফিজ : খবরদার, অমন কাজও করবেন না। (ফিস্ ফিস্ করিয়া) পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার! বুঝতে পারছেন না–এটা–ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ করুন আমি কী রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেবো। (ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে! বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে।) এই।–এই! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ! এই! হেই। (মূর্তি নীরব! নিশ্চল) (ঘুরিয়া) স্যার, কোন সাড়া দিচ্ছে না যে?

নেতা : বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোন কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। চলো আমরা আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ : তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাবো? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরৎ না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না স্যার!

মূর্তি : আমি যাবো না। আমি থাকবো। (দু'জনে হতবাক। ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়)।

হাফিজ : কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে?

মূর্তি : কবরে যাবো না–এখানে থাকবো।

হাফিজ :অবুঝের মতো কথা বলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ । অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি : মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না।

হাফিজ : (নেতার কাছে আসিয়া) বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার? যদি কিছু আছর হয়! পারবেন না স্যার? আপনি তো বলেছিলেন–যাই হোক–বক্তৃতা দিতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না!

নেতা : (ভালো করিয়া শুনিয়া) দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি! কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে উঠে বসে–

মূর্তি : কবরে যাবো না।

নেতা : আগে কথাটা ভালো করে শোনো। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি : ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিঁটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে কওমের নামে দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি–তাদের নামে–মিনতি করছি–তুমি যাও, যাও, যাও!

মূর্তি : আমি বাঁচবো।

নেতা : কী লাভ তোমার বেঁচে? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কী লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না! তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবি অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবি অ্যাসেম্বলীতে পাশ করিয়ে নেবো। দেশজোড়া তোমার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো। দোহাই তোমার তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। মরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

(সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত-মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্তরেখা।)

কে? তুমি কে?

মূর্তি (২) : নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানী ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ এপিঠ। বোকা ডাক্তার খামাকা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্তি (২) : গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।

নেতা : তুমি আমাকে চেন?

মূর্তি (২) : চশমাটা আর খুঁজে পাইনি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা : আমার কথা শুনেছ? এইমাত্র যা বলছিলাম?

মূর্তি (২) : আপনি মিথ্যাবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি : আমরা কবরে যাবো না।

মূর্তি (২) : আমরা বাঁচবো। (বিড়বিড় করতে করতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।) (নেতা মাথা নিচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্ ফিস্ করিয়া)

হাফিজ : হবে না। এই লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলবো। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। (হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মতো মাথার উপর তুলিয়া দিল।)

নেতা : ঢং ছাড়ো। মেয়েলোকের মতো ঘোমটা দিয়েছো কেন?

হাফিজ : (ফিস্ ফিস্ করিয়া) চুপ। আমি এখন স্ত্রীলোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছে, কিছু ধরতে পারবে না।

(আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রীলোকের মতো করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।) খোকা! খোকা!

মূর্তি : (চঞ্চল। বেদনাহত!) কে? কে ডাকে?

হাফিজ : খোকা কোথায় গেলি তুই? খো-কা!

মূর্তি : ... কে? মা? মা। তুই কোথায় মা? (শূন্যে হাতড়ায়।)

হাফিজ : এই যে যাদু, আমি এখানে।

মূর্তি : তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ না মা? তুমি বারণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকলো। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও–সেই জন্য তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কী করে জানলে মা?

হাফিজ : মা হলে সব জানতে হয়। মা হলে জানতি, মার কষ্ট কী! মার বুক খালি হলে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি : তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে এল। আমার তখন খালি কী মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে–ঠিক তেমনি। আর আমার নাক-মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

হাফিজ : তবু তো কোন কথা শুনিস্ না। কেবল মার দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস। এ তোদের কী নতুন নেশা! এত মরণ-পাগল কেন তোরা?

মূর্তি : মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বারবার এসে বকবে–কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারীর ফাঁক দিয়ে ছায়া-মূর্তির মতো ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট এলোমেলো শরীরটা দেখবো–দেখবো–মা, চলে যেও না–মা! তোমায় আমি দেখবো–তোমায় আমি আদর করবো মা–তুমি কোথায় মা?–মা!

হাফিজ : ঘুমের ঘোরে কী বকছিস? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? অনেক রাত হয়েছে লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার শুতে যা।

মূর্তি : আমাকে শুতে যেতে বলছো মা? না। না। আমি শোব না। আমি এখন শোবো না মা। আমি আর কোনদিন শোবো না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা–না, না আমি শোবো না। আমি যাবো না। আমি থাকবো। আমি উঠে আসবো!

নেতা : ইন্সপেক্টর! তোমার এ ভূতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে?

হাফিজ : ছিঃ বাবা! জিদ করো না। লক্ষ্মীটি শুতে যাও। মার কথা শোনো।

(দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়)

মূর্তি (২) :(অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া) মিন্টু! মিন্টু! মিন্টু ঘুমায়নি এখনও?

হাফিজ : (সুর পাল্টাইয়া) তোমার কোলে আসার জন্য কাঁদছে।

মূর্তি (২) :দাও, আমার কোলে দাও। (বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে) ইস! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো!

নেতা : খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। এই শেষবারের মতো বলছি এখনও ভালো চাও তো সরে পড়ো। চলে যাও সব।

মূর্তি : আমি যাবো না। আমি বাঁচবো মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরো হাঁটবো মা। ঠাণ্ডা রুপোর মতো পানি চিরে হাত পা ছুড়ে সাঁতার কাটবো মা!

মূর্তি (২) : কাঁদিসনে মিন্টু! তোর বাপ কি কম চেষ্টা করেছে? দুষ্টু মুদী কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে।

নেতা : কাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি? না আমি তা পারবো না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট! ডেভিলস! যাও বলছি।

হাফিজ : উত্তেজিত হবেন না স্যার! কুল্‌লি! কুউললি!

মূর্তি : তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেবো না মা। আমি কিছুতেই মরবো না। ছায়ামূর্তির মতো বার বার আসবো। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ো, দরজায় এসে টোকা দেবো। চৌমাথার মোড়ে

দাঁড়িয়ে হাতখানি দিয়ে তোমারে ইশারা করবো। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো মা।

মূর্তি (৩) : (কোলের কল্পিত সন্তানকে) দূর বোকা! তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কী আছে? তুই তো আমার কোলে! আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। (সামনের দিকে ইশারা করিয়া) ওগুলো কিছু না। সব সঙ সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা : ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানি না। আমি সব পুঁতে ফেলবো। একটা একটা করে গুলি করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। হাজার হাজার হাত মাটির নিচে সব পুঁতে ফেলবো। যাতে কোনদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলি, সবগুলোকে আবার গুলি করো। গার্ড!

(হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির)

ফকির : জ্বী হুজুর।

নেতা : (লক্ষ্য না করিয়া) গুলি করো।

ফকির : গুলি ওহ্! হ্যাঁ! আছে। আমার কাছে আরো কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা। টাটকা! এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন!

(স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে) লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।)

(নেপথ্যে মুর্দা ফকির চিৎকার করিতেছে : তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি। গুলি হবে, স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব! কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলি–গুলি হবে আজ! কবর খালি করে সব উঠে আয়!)

(মঞ্চের উপরের লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন–ক্রমে আরও অনেক–সারি দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।)

নেতা : (বিবর্ণ মুখে) ইন্সপেক্টর! হার্টটা জানি কেমন করছে। বড় ভয় পেয়ে গেছি! একটু ধরে রেখো আমাকে! আর আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফিজ : না! আপনার এখন হুঁশ নেই! আমার নিজেরও হয়তো নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না!

(পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।)

নেতা : (চমকিয়া) কে? এটা কী আবার?

হাফিজ : (দেখিয়া) ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি। কী চাও?

গার্ড : গাড়িতে উইড্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিও শেষ হইতেও আর দেরী নাই।

হাফিজ : (প্রথম লক্ষ করিল যে, মঞ্চ খালি! ভালো করে কয়েকবার চোখ কচলায়) গুড! সব কাজ খতম তো? গুড্! সব কাজ খতম স্যার। নীট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার। ভালো করে দেখুন না নিজেই।

নেতা : (ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে) হুম!

গার্ড : কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর? খুঁইজা দেখুম?

নেতা : না চলো।

হাফিজ : মানে... কিছু না স্যার! এসব কিছু না। গোরস্তানে এরকম কত কিছু হয়। তার উপর আবার স্যার...

নেতা : হুম। চলো! আর দ্যাখো মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক। (বুকে হাত চাপিয়া ধরে।)

হাফিজ : অ্যাঁ? মুর্দা ফকির? ওহ্! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ইয়েস স্যার!

(সকলেই ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস, বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)

যবনিকা

লেখক পরিচিতি

মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে ইংরেজিতে এমএ, ১৯৫৪ সালে কারাগার থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এমএ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করেন। চাকরিজীবনের প্রথম দিকে তিনি খুলনার দৌলতপুর কলেজে, ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে কারারুদ্ধ করে রাখে। কৃতী অধ্যাপক, নাট্যকার, সমালোচক ও শ্রোতা-সম্মোহনকারী বক্তা হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত নাটক–'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'কবর', 'রূপার কৌটা', 'মুখরা রমণী বশীকরণ' ইত্যাদি। শেক্সপিয়র, গলসওয়ার্দী ও বার্নাড শ-এর অনুবাদে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ হিসেবে *মীরমানস*, *তুলনামূলক সমালোচনা*, বাংলা গদ্যরীতি বিশেষভাবে উলেখ্ল যোগ্য। নাট্যচর্চায় মুনীর চৌধুরী বিষয় নির্বাচন, অবয়ব নির্মাণ এবং মঞ্চায়নের বিচারে অত্যাধুনিক ও মননশীল ছিলেন। ভাষা-আন্দোলনের সমকালীন ইতিহাসকে বিষয় করে তিনি যে 'কবর' নাটক রচনা এবং জেলের মধ্যে নাটকটি যেভাবে হারিকেনের আলোয় মঞ্চায়ন করেছিলেন, তা আজও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তিতুল্য ঘটনা হয়ে আছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের পর মুনীর চৌধুরীর কবরের মতো আর কোন নাটক এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী নাট্যকার হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৪ ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনতা-বিরোধী আলবদর বাহিনীর দ্বারা অপহৃত ও শহীদ হন।

মূলভাব

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। গভীর রাত। গোরস্তানে ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের গোপনে দাফন করার জন্য আনা হয়েছে। এদিকে জারি করা হয়েছে সান্ধ্য-আইন। সমস্ত এলাকা জনশূন্য। লাশগুলো দাফন করার দায়িত্ব পড়েছে একজন রাজনৈতিক নেতা ও একজন পুলিশ অফিসারের ওপর। গোরস্তানে রয়েছে গার্ড। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। গোরখোদকেরা গোর খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত। এই নাটকের রাজনৈতিক নেতা এবং হাফিজ চরিত্র দুটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও শোষক শ্রেণির চাটুকার ও দোসরদের প্রতিভূ। অন্যদিকে ফকির অকুতোভয়, প্রতিবাদমুখর সাহসী বাংলার সন্তান। নেতা ভয় ও শীতের রাতের ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো ও মদ্যপানরত। গোরখোদকেরা একই কবরে সমস্ত লাশ দাফন করতে রাজি নয়। ঐ সময় আগমন ঘটে মুর্দা ফকিরের। মুর্দা ফকির জানে না লাশগুলো কাদের। মুর্দা ফকির বিশেষ এক মুহূর্তে হাজির হওয়ায় হাফিজ এবং নেতা উভয়েই বিস্মিত। মুর্দা ফকির কৌশলে লাশের পরিচয় নিয়ে নেয়। হাফিজ আর নেতা দুজনেই

মদের নেশায় চুর হয়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দকে তারা গুলির শব্দ মনে করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে এটা ফকিরের কাণ্ড। কিন্তু চোখ তুলে তাকাতেই অন্ধকারের মধ্যে দেখে সামনে একটি ছাত্রের বুলেটবিদ্ধ লাশ, যার মাথার খুলি নেই। হাফিজ আর নেতা লাশের কাছে জানতে চায়–সে কী চায়। কিন্তু কোনো উত্তর মেলে না। লাশের মুখে বুলি ফোটে। সে বলে যে সে কোনোভাবেই কবরে যাবে না, ওখানেই থাকবে। এরই মাঝে উপস্থিত হয় দ্বিতীয় লাশের ছায়ামূর্তি। সে ছিল হাইকোর্টের কেরানি। গুলি তার এপিঠ-ওপিঠ করে ফুসফুসের ভেতর চলে গেছে। সেও কবরে যেতে নারাজ। হাফিজ শেষে ছলনা করে মায়ের মিথ্যা অভিনয় করে খোকাদের ধোঁকা দেয়। তার কৌশল সফল হয়। এই চাতুর্য সফল হয়েছে এই কারণে যে মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদেরা কেবল মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মায়ের কাছে নতজানু হতে জানে।

'কবর' নাটকে বাংলার বীর সন্তানদের স্বদেশপ্রেম, আত্ম-সচেতনতা এবং মাতৃভাষাপ্রীতি কবরে ফিরে না যাওয়ার প্রতীকে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ, তারা যে অমর, দেশের মুক্তির জন্য শহীদ এবং একদা তাদের এ আত্মত্যাগ দেশমাতৃকার জন্য বড় মুক্তি এনে দেবে, এ নাটকে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

অধ্যায় ৯

বাংলা ভাষার উপাদান

বাংলা ভাষার উপাদান

ভাষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘ভাষ্’ ধাতু থেকে যার অর্থ কথা বলা। ভাষার সাহায্যেই মানুষ তার চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, মনের ভাব প্রকাশ করে। চার্লস এফ হকেটের মতে ‘ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য (Differentia) যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে’ (মুহাম্মদ দানীউল হক, ১৯৯০)। মানুষ তার এ মহৎ বৈশিষ্ট্যটি হাজার হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে।

মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তার যদি কোন অর্থ প্রকাশ হয় তবে তা ভাষার মর্যাদা লাভ করে। বাগ্‌যন্ত্র বা কথাবলার যন্ত্র বলতে বোঝায় ফুসফুস, গলনালী, গলা, দাঁত, মাড়ি, জিব, ঠোঁট, নাক, তালু, স্বরতন্ত্রী, মুখগহ্বর ইত্যাদি। ফুসফুসই বাগধ্বনি সৃষ্টির মূল কেন্দ্র। শ্বাস নেবার প্রয়োজনে যে বাতাস গ্রহণ করা হয় তা ছেড়ে দেবার সময় গলনালী ও মুখের ভেতরের বিভিন্ন স্থানে নানা ভাবে বাধা পায়। এই বাধার স্থান, রূপ ও পরিমাপ অনুসারে বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ধ্বনি মিলে হয় শব্দ। শব্দে থাকে অর্থ। এভাবে মানুষ মনের ভাবের যথাযথ প্রকাশ ঘটায় শব্দের মাধ্যমে।

বাংলা ভাষার মূল উপাদানসমূহ

মানুষ তার বক্তব্য প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার অর্থবোধক ধ্বনি সৃষ্টি করে থাকে। বাগ্‌যন্ত্র থেকে উৎপাদিত অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি। ধ্বনি ভাষার মৌখিক বা উচ্চারিত রূপ। এর লিখিত রূপ হলো বর্ণ। অনেকগুলো ধ্বনি মিলে তৈরি হয় একটি শব্দ। আবার অনেকগুলো শব্দ মিলে সৃষ্টি হয় একটি বাক্য। এ ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যই ভাষার মৌলিক বা মূল উপাদান। যেমন-

ধ্বনি সম্পর্কিত ধারণা

ধ্বনি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। একে আর ভাগ করা যায় না। বাংলা ভাষার ধ্বনিসমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে সুবিন্যস্ত। এর আছে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি।

স্বরধ্বনির প্রকারভেদ : বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : (ক) মৌলিক স্বরধ্বনি ও (খ) যৌগিক স্বরধ্বনি।

ক) **মৌলিক স্বরধ্বনি :** একটি মাত্র মূল স্বরধ্বনিকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। এদের বিশ্লেষণ বা ভাগ করা যায় না। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। এগুলো হচ্ছে : অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। বাংলা ভাষায় অ্যা ধ্বনিটি আছে, কিন্তু তার জন্য কোনো বর্ণ নেই।

খ) **যৌগিক স্বরধ্বনিঃ** পাশপাশি দুটি স্বরধ্বনি তাড়াতাড়ি এবং এক প্রয়াসে উচ্চারণের ফলে তা একটি যুক্তধ্বনিতে রূপ নিলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বা দ্বি-স্বর বলে। যেমন : অ + ই = অই (ঐ), অ + উ = অউ (ঔ)। বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ এ-দুটি বর্ণকে মৌলিক বর্ণের মতো স্থান দেওয়া হয়েছে। ধ্বনি বিজ্ঞানীগণের মতে বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত দিক থেকে একত্রিশটি পর্যন্ত যৌগিক স্বরধ্বনি হতে পারে। এর মধ্যে ১৯টি নিয়মিত এবং ১২ টি অনিয়মিত।

নিয়মিত যৌগিক স্বরধ্বনিঃ

অ	+	ও	=	অও	–	লও, নও		এ	+	ই	=	এই	–	সেই, যেই
অ	+	এ(য়)	=	অয়	–	হয়, নয়		এ	+	উ	=	এউ	–	কেউ, ঘেউ
আ	+	ই	=	আই	–	গাই, যাই		এ	+	ও	=	এও	–	খেও, সেও
আ	+	এ(য়)	=	আয়	–	খায়, যায়		ও	+	ই	=	ওই(ঐ)	–	বই, কই
আ	+	ও	=	আও	–	যাও, খাও		ও	+	উ	=	ওউ(ঔ)	–	বউ, মউ
আ	+	উ	=	আউ	–	লাউ, ঝাউ		ও	+	ও	=	ওও	–	শোও, ধোও
ই	+	ই	=	ইই	–	দিই, নিই		ও	+	এ(য়)	=	ওয়	–	ধোয়, শোয়
ই	+	উ	=	ইউ	–	মিউ,পিউ		অ্যা	+	এ	=	অ্যায়	–	দ্যায়, ন্যায়
উ	+	ই	=	উই	–	ছুঁই, রুই		অ্যা	+	ও	=	অ্যাও	–	ম্যাও, দ্যাও
উ	+	উ	=	উও	–	কুউ্, কুউ্								

অনিয়মিত যৌগিক স্বরধ্বনিঃ

ই	+	য়া	=	ইয়া	–	দিয়া, নিয়া		অ	+	য়া	=	অয়া	–	সয়া
ই	+	য়ে	=	ইয়ে	–	গিয়ে, পিয়ে		ও	+	য়া	=	ওয়া	–	মোয়া, রোয়া
ই	+	ও	=	ইও	–	নিও, দিও		ও	+	য়ে	=	ওয়ে	–	ক’য়ে, স’য়ে
এ	+	য়া	=	এয়া	–	দেয়া, নেয়া		উ	+	য়ে	=	উয়ে	–	শুয়ে, রুয়ে
এ	+	য়ো	=	এয়ো	–	চেয়ো, যেয়ো		উ	+	য়া	=	উয়া	–	নুয়া, জুয়া
অ্যা	+	য়া	=	অ্যায়া	–	দ্যায়া(দেওয়া)		উ	+	য়ো	=	উয়ো	–	কুয়ো

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ

ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুসের ভূমিকাই প্রধান। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পথে বাক্‌প্রত্যঙ্গের কোনো-না-কোনো স্থানে বাধা পায়। ফলে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। সাধারণত (ক) ফুসফুসতাড়িত বাতাসের চাপ, (খ) স্বরতন্ত্রীর অবস্থা, (গ) উচ্চারণের স্থান এবং (ঘ) উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্নগুলোকে নানাভাবে ভাগ করা যায়।

ক) ফুসফুসতাড়িত বাতাসের চাপের ওপর নির্ভর করে শ্রেণিকরণ: মুখ দিয়ে ফুসফুস তাড়িত বাতাস বের হওয়ার সময় বা ফুসফুসতাড়িত বাতাসের চাপের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে ব্যঞ্জনধ্বনি দু'প্রকার। যথা :

১। **অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন :** যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বের বাতাস কম বের হয় বা বাতাসের চাপ কম হয় সেগুলোকে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালার প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি হলো অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি।

২। **মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন :** যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় সজোরে নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায় বা বাতাসের চাপ বেশি থাকে সেগুলোকে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালার দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি হলো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি।

খ) স্বরতন্ত্রীর (কম্পনের দিক থেকে) অবস্থাভেদে শ্রেণিকরণ : স্বরতন্ত্রীর মাঝখান দিয়ে ফুসফুসে বাতাস আসে যায়। তখন কিছু সংখ্যক ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়। আবার কিছু সংখ্যক ধ্বনি উচ্চারণে কম্পন সৃষ্টি হয় না। স্বরতন্ত্রীর এ দুরকম অবস্থার ওপর নির্ভর করে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১। **অঘোষ ব্যঞ্জন :** যে-সব ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কাঁপে না সেগুলোকে অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালায় প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি হলো অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি।

২। **ঘোষ ব্যঞ্জন :** যে-সব ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কাঁপে সেগুলোকে ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালায় প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি হলো ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি।

বাংলা অঘোষ ও ঘোষ ব্যঞ্জনগুলো সারণিতে দেখানো হলো:

	ধ্বনি-সংকেত	
ধ্বনি	অঘোষ	ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ
	ঘোষ	গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, র, ল, ড়, ঢ়, হ

গ) উচ্চারণস্থান অনুসারে শ্রেণিকরণ : উচ্চারণস্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো নানারকম হতে পারে। যথা :

জিভের পেছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়	জিহ্বামূলীয় ধ্বনি	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
জিভ প্রসারিত হয়ে সামনের অংশ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়	তালু	চ, ছ, জ, ঝ, শ
জিভের সামনের অংশ উপরে গিয়ে শক্ত তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়	তালু-দন্তমূল	ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়
জিভের সামনের অংশ উপরের পাটি দাঁতের নিম্ড়বাংশকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়	দন্ত ধ্বনি	ত, থ, দ, ধ, ন
এক বা দুই ঠোঁট ব্যবহৃত হয় ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ্য ধ্বনি	প, ফ, ব, ভ, ম
জিভের অগ্রভাগ ও উপরের পাটি দাঁতের মূল বা নিচের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত হয়	দন্তমূল	ন, র, ল, স
কণ্ঠনালির মধ্যে ধ্বনিবাহী বাতাস বাধা পেয়ে উচ্চারিত হয়	কণ্ঠ্য ধ্বনি	হ

ঘ) উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে শ্রেণিকরণ করা যায়:

বাগযন্ত্র দুটি একত্রে সংযুক্ত হয়, অতঃপর মুখের মধ্যে সঞ্চিত বাতাস দ্রুত বেগে বেরিয়ে যায়।	স্পর্শ	ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ
বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তারপর নাক দিয়ে অথবা নাক ও মুখ দিয়ে যুগপৎভাবে বেরিয়ে যায়	নাসিক্য	ঙ, ম, ন
জিভ কম্পিত হয়ে উচ্চারণস্থান স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়	কম্পনজাত	র
জিভের নিচের অংশ দাঁতের মূলে একটিমাত্র টোকা দিয়ে উচ্চারিত হয়	তাড়নজাত	ড়, ঢ়
ফুসফুস-আগত বাতাস বাধা পায় ও সংকীর্ণ পথে বের হওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে	ঘর্ষণজাত	স, শ, হ
দুই ঠোঁট গোলাকৃত হয়ে সংকুচিত হয় ও বাতাস বেরিয়ে যায়	নৈকট্যমূলক	অন্তস্থ ব, অন্তস্থ য়
দুটি জিভের প্রান্ত ও দন্তমূলের খুব কাছাকাছি থেকে আসে	পার্শিক নৈকট্যমূলক	ল

বাংলা ভাষায় শব্দের গঠন বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি যেমন ভাষার ক্ষুদ্রতম একক তেমনি শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক। অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে আমরা শব্দ বলি। তুমি, আমি, ফুল, পাখি এ সবগুলোই শব্দ। আবার শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে একটি ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে পদ বলে। যেমন - তুমি আমি মিলে ফুলের মালা সাজাই। এ বাক্যে তুমি আমি ফুল মালা সাজাই প্রতিটিই এক একটি পদ। বাক্যেও প্রতিটি শব্দ গঠিত হয়েছে অসংখ্য ধ্বনি মিলে। আবার প্রতিটি শব্দের বা পদের অর্থ রয়েছে। তাহলে বলা যায় অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই শব্দ। যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ নেই তাকে আমরা শব্দ বলতে পারি না। নতুন নতুন শব্দ ভাণ্ডারই ভাষার সম্পদ। ভাষায় নতুন নতুন শব্দ বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ নানাভাবে গঠিত হয়েছে। গঠন অনুসারে বাংলা শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. মৌলিক শব্দ
২. সাধিত শব্দ

মৌলিক শব্দ: যে সব শব্দকে ভাঙ্গা বা বিশ্লেষণ করা যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দ ভাঙতে চাইলেও তার ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট অংশের কোনো অর্থ হয় না। সেকারণে অবিভাজ্য বা অর্থযুক্ত শব্দই মৌলিক শব্দ। অর্থাৎ স্পষ্ট অর্থ ও অবিভাজ্যতাই মৌলিক শব্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন- ঘোড়া, ফুল, মা ইত্যাদি। এ শব্দগুলোকে ভাঙ্গলে ভাঙ্গা অংশের কোন অর্থ হয় না।

সাধিত শব্দ: যে সকল শব্দকে ভাঙ্গা যায় এবং ভাঙ্গা অংশেরও অর্থ থাকে তাকে সাধিত শব্দ বলে। মৌলিক শব্দ থেকেই সাধারণত সাধিত শব্দ গঠন করা হয়। সাধিত শব্দমাত্রই বিশ্লেষণযোগ্য। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন: বিদ্যালয় (বিদ্যা+ আলয়), দম্পতি (জায়া ও পতি)। সাধিত শব্দ প্রধানত চারটি উপায়ে গঠিত হয় - (১) সন্ধির সাহায্যে, (২) সমাসের সাহায্যে, (৩) উপসর্গ যোগে, (৪) প্রত্যয় যোগে।

শব্দের নানাবিধ প্রয়োগ

শব্দের রূপবৈচিত্র্য তার প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করলে শব্দের এই ভূমিকা শুরু হয়। শব্দ থাকে অভিধানে। অভিধানে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ্ তা কেবলই শব্দ। আর বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তা হয়ে যায় পদ। বাংলা বাক্যে ভিন্ন-ভিন্ন পদের ভূমিকা এবং পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে পদকে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয় – এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। বাক্যে পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য অথবা বাক্যের মধ্যে পদগুলোর ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্য শব্দের সঙ্গে যোগ করা হয় বিভক্তি।

অব্যয়ের কোনো রূপবৈচিত্র্য নেই, অব্যয়ের সাথে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। শুধু বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ্য (বা নাম পদ) ও সর্বনামের বিভক্তি একই বিভাগে আলোচ্য। এই বিভাগটি হলো কারক-বিভক্তি। বিশেষণ যখন বিশেস্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন তার সঙ্গে সাধারণত কোনো কারক-বিভক্তিই যোগ হয় না। সুতরাং বিভক্তি যোগে রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয় প্রধানত নাম বা বিশেষ্যের ও ক্রিয়ার। এটিই শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ হিসেবে বিবেচিত। বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কাল ইত্যাদি রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে।

বাক্য সম্পর্কিত ধারণা

: আপনি কেমন আছেন?

: ভাল।

উপরের সংলাপে দুটো বাক্য রয়েছে। প্রথমটিতে তিনটি শব্দ মিলে একটি বাক্য গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে একটি মাত্র শব্দে একটি বাক্য গঠিত হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় সংলাপে কর্তা 'আমি' উহ্য রয়েছে। দুটো সংলাপেই বক্তার পুরো মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পর পর একাধিক শব্দ বা পদ মিলে যদি কোন পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হয় তাহলে তাকে আমরা বাক্য বলতে পারি। অবশ্য শব্দ বা পদগুলো যথেচ্ছভাবে মিলিত হলেই বাক্য হয় না। এজন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকতে হয়। একটি সার্থক বাক্যের কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সার্থক বাংলা বাক্যের গুণ তিনটি ।যথা-

১। আকাঙ্ক্ষা
২। আসত্তি
৩। যোগ্যতা

আকাঙ্ক্ষা: কোন একটি বাক্য শুরু করার পর শ্রোতার পুরো বাক্যটি শোনার ইচ্ছে জাগে। যদি বলা হয় আজ সারাদিন ধরে...। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় আজ সারাদিন ধরে কী? বৃষ্টি? রোদ? নাকি তার অপেক্ষা করে আছি? অর্থাৎ বাক্যের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করে তাকে আকাঙ্ক্ষা বলতে পারি।

আসত্তি: আসত্তি মানে হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ততা বা নৈকট্য। একটি বাক্যে শব্দ বা পদ যথেচ্ছভাবে সাজালে মনোভাব সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। তাকে সম্পর্কক্রমে সাজাতে হয়। বাক্যের ক্রমসজ্জাকে আসত্তি বলা যেতে পারে। যেমন *কাল সারা রাত ছিল স্বপনের রাত* গানের কলিটি যদি লিখি *রাত স্বপনের সারা কাল ছিল রাত*

তাহলে গানের কলি হওয়াতো দূরের কথা, বাক্যই হয় না।

যোগ্যতা: বাক্যের শব্দসজ্জা ও সম্পূর্ণতা সবই ঠিক আছে কিন্তু অর্থটি ঠিক নেই তাহলে বাক্য সার্থক হয় না। যেমন: জল দিয়ে আগুন জ্বালাই। বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও যৌক্তিকতাকে প্রতিফলিত করছে না।অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত ও ভাবগত মিলকে আমরা বলতে পারি যোগ্যতা।

বাক্যের প্রাকারভেদ

গঠন অনুসারে বাক্য: গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যেমন:

১) **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা: সাজ্জাদ বই পড়ে। এখনে সাজ্জাদ কর্তা এবং পড়ে সমাপিকা ক্রিয়া।

২) **জটিল বাক্য:** যে বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত মুখ্য অংশ ব্যতীত, এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন: যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভ করে। এখানে ‘যে পরিশ্রম করে’ নির্ভরশীল বাক্য এবং ‘সেই সুখ লাভ করে’ প্রধান খণ্ড বাক্য।

৩) **যৌগিক বাক্য:** দুই বা ততোধিক সরল, জটিল অথবা সরল ও জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: লোকটি ধনী কিন্তু অসুখী।

অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ: অর্থ অনুসারে বাক্যকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

১) **বিবৃতিমূলক বাক্য:** কোনো ঘটনা ভাব বা বক্তব্যের তথ্য যে বাক্য প্রকাশ করে তাকে বলা হয় **বিবৃতিমূলক** বাক্য। যেমন: সে একটি গল্পের বই পড়ছে। বিবৃতিমূলক বাক্য আবার দুই প্রকারের- হ্যাঁবোধক (Affirmative) বাক্য এবং নাবোধক (Negative) বাক্য

২) **প্রশ্নবোধক বাক্য:** কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সম্পর্কে যে বাক্যে কোনো প্রশ্ন থাকে তাকে বলা হয় প্রশ্নবোধক বাক্য। যেমন: তোমার নাম কি?

৩) **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য:** অনুজ্ঞাসূচক বাক্য আজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আমন্ত্রণ, নিষেধ ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন: গুরুজনের কথা অমান্য করো না।

৪) **প্রার্থনাসূচক বাক্য:** যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা প্রকাশ পায় তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন: প্রভু আমাদের দেশের মঙ্গল করুন।

৫) **কার্যকারণাত্মক বাক্য: এইরূপ বাক্যে কোনো নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত দ্যোতিত হয়।** যেমন: টাকা পেলে শোধ করে দেব।

৬) **সন্দেহবোধক বাক্য:** নির্দেশবাচক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদির ভাব থাকলে তাকে সন্দেহবোধক বাক্য বলা হয়। যেমন: হয়তো সে আসবে না।

৭) **বিস্ময়সূচক বাক্য:** হর্ষ, বিস্ময়, দুঃখ, শোক, কাতরতা, করুণা, প্রশংসা, আবেগ বা উচ্ছ্বাসের আকস্মিকতা যে বাক্যে প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়। যেমন: কী সুন্দর দৃশ্য!

৮) **ইচ্ছাবোধক বাক্য:** যে বাক্যে মনের কোনো ইচ্ছা প্রকাশিত হয় তাকে ইচ্ছাবোধক বাক্য বলে। যেমন: তুমি যেন পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে পার।

বাক্য গঠনের নিয়ম

১. প্রতিটি বাক্যে থাকে কর্তা ও ক্রিয়াপদ।
২. প্রতিটি বাক্যে কমপক্ষে একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়া থাকা চাই।
৩. বাক্যের সাধারণ গঠন হলো : কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। যেমন :

কর্তা	**কর্ম**	**ক্রিয়া**
সুমি	বই	পড়ে
সুমন	স্কুলে	যায়

৪. কর্তা ক্রিয়ার পরেও বসতে পারে। যেমন, তার নাম ছিল সুমন। এখানে সুমন হলো কর্তা।
৫. সাধারণত সম্বোধন পদ (যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়) বাক্যের শুরুতে বা সবার শেষে বসে। যেমন, শফিক, এদিকে এসো। এদিকে এসো শফিক। এখানে শফিক হচ্ছে সম্বোধন পদ।
৬. অনুজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ, অনুরোধ বোঝাতে কর্তা উহ্য থাকে। যেমন, পড়তে বস। এ বাক্যে কর্তা হলো তুমি। বাক্যটি আসলে 'তুমি পড়তে বসো।' এখানে কর্তা 'তুমি' উহ্য রয়েছে।

৭. সংযোজক অব্যয় (ও, এবং, আর) দিয়ে একাধিক বিশেষ্য পদ সংযুক্ত থাকলে, সাধারণত শেষের পদটির সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : সে করিম ও রমার বন্ধু। বই, খাতা আর কাগজের দাম বাড়ল।
৮. আবেগ প্রকাশক অব্যয় পদ সাধারণত বাক্যের শুরুতে বসে। যেমন : আঃ কী আরাম! ওঃ কী দুঃখ!
৯. বিশেষণ পদ বিশেষ্যের আগে বসে। সুন্দর জামা, নীল আকাশ ইত্যাদি।
১০. সর্বনামের বিশেষণ সাধারণত পরে বসে। যেমন, তিনি পণ্ডিত লোক।
১১. ক্রিয়া-বিশেষণ সাধারণত ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন : সে জোরে কথা বলে। এখানে **জোরে** শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ।
১২. সাধারণত বাক্যের প্রথমে অধিকরণ কারক বসে। যেমন : নদীতে মাছ থাকে। আবার ক্রিয়ার পরেও বসতে পারে। যেমন : মাছ থাকে নদীতে। এ বাক্যে **নদীতে** শব্দটি অধিকরণ কারক।
১৩. করণ কারক কর্মের আগে বসে। যেমন : জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরে। এখানে মাছ ধরা হলো কর্ম, আর করণ কারক হলো জাল দিয়ে।
১৪. অপাদান কারক-বাচক পদ যা থেকে উৎপন্ন তার আগে বসে। যেমন : তিল থেকে তৈল হয়।

ওপরের নিয়মগুলোই যে বাক্য গঠনের একমাত্র নিয়ম তা নয়। বাক্য মানে মনের ভাব প্রকাশ। যেভাবে ভাব ভাল করে প্রকাশ পায়, বাক্য সেভাবেই গঠন করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণ ভট্টাচার্য (১৯৮১), নন্দনতত্ত্বের সূত্র, উত্তরসুরি, কলিকাতা।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৮৪), বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি., কলিকাতা।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৭৭), ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৫), বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, আনন্দ, কলিকাতা।

৫. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৮৫), আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, বাংলা একাডেমি।

৬. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০০২), আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৭. অ্যারিস্টটল, কাব্যতত্ত্ব :, শিশিরকুমার দাশ অনুদিত (১৯৭৭), আশা প্রকাশনী, কলকাতা।

৮. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (১৯৮৫), সাহিত্যে রূপরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৯. জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০০১), ধ্বনিবিজ্ঞাণের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১০. টেরি ঈগলটন, মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা,অনু : নিরঞ্জন গোস্বামী(২০০১), দীপায়ন, কলকাতা।

১১. তারাপদ মুখোপাধ্যায় (১৯৫৯), আধুনিক বাংলা কাব্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।

১২. নরেন বিশ্বাস (২০০০), অলংকার অন্বেষা, অনন্যা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৩. রফিকুল ইসলাম (২০০২), ভাষাতত্ত্ব, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

১৪. সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় (১৯৯৬), ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, কলকাতা।

১৫. রমিসা বেগম ও অন্যান্য (১৯৯৯), মাতৃভাষা বাংলা, সার্ড, বাউবি, ঢাকা।

১৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯), ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

১৭. মাহবুবুল আলম সম্পাদিত (১৯৭১), সাহিত্যতত্ত্ব,খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা।

১৮. মাহবুবুল আলম (২০০৮), বাংলা ছন্দের রূপরেখা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৯. মাহবুবুল আলম (২০১৩), বাংলা সাহিত্যের রূপ ও রীতি, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২০. মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৮৫), ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

২১. মুহাম্মদ দানীউল হক (১৯৯০), ভাষার কথা, ধানশীষ, ঢাকা।

২২. মুহাম্মদ নাজমুল হক ও অন্যান্য (১৯৯৯), উচ্চতর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি, ঢাকা।

২৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (২০০৮), বাংলা কবিতার ছন্দ, প্রভাতী প্রকাশন, ঢাকা।

২৪. শিশিরকুমার দাশ (১৯৯৭), ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস।

২৫. শ্রীমতী কল্যাণী কারলেকার (১৯৬৩), বাংলা ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি, মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

২৬. শ্রীশচন্দ্র দাশ (২০০০), সাহিত্য সন্দর্শন,কল্লোল প্রকাশনী, ঢাকা।

২৭. রোকনুজ্জামান খান (১৯৬৮), আমাদের শিশু সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২৮.দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯২), আধুনিক কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।
২৯.শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৩৬৭), মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।
৩০.ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৯৮), মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।
৩১.যোগীন্দ্রনাথ বসু (২০০৪), মাইকেল মধূসূদন দত্তের জীবনচরিত, দে'জ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।
৩২.সন্‌জিদা খাতুন (১৯৬৯), সত্যেন্দ্র-কাব্য পরিচয়, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
৩৩.সুশীলকুমার সেনগুপ্ত (১৩৯৫), নজরুল চরিতমানস, দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৩৪.বুদ্ধদেব বসু (১৯৮২), প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৩৫.দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৫৯), আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, নাভানা, কলিকাতা।
৩৬.শিবনারায়ণ রায় (২০০১), প্রবন্ধ সংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।
৩৭.সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭৯), হোরেসের কাব্যতত্ত্ব, বর্ণমিছিল, ঢাকা।
৩৮.সুধীরকুমার নন্দী (১৯৮৪), নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।